মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
জেলা জজ

www.amarboi.org

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
জেলা জজ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৫২

২য় প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪২৯
চৈত্র ১৪১৪
মার্চ ২০০৮

বিনিময় মূল্য ঃ ৫৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MANOBADHEKAR PROTISTAY ISLAM by Mohammad Serazul Islam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 56.00 Only.

www.amarboi.org

উৎসর্গ

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। ঐ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে আল্লাহর সিফত বা গুণের অধিকরণের মাধ্যমে। ঐ সিফত অধিকরণের জন্য যুগে যুগে যে সকল মহামানবগণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে মৃত্যুবরণ করেছেন সেই সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য এই পুস্তকটি উৎসর্গ করা হলো।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সূচীপত্র

মানুষ কে ও কেন ?	১১
মানবতার জন্য কলংকময়	২০
বিকল্পে বর্তমান প্রথা	২৯
দাসপ্রথা জনিত ব্যবস্থা উচ্ছেদে কোরান হাদীস	৫০
শেষ কথা	৭৬

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ভূমিকা

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কোরানের ভাষায় মানুষকে 'আশ্‌রাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই মানুষকে তিনি তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেও তাঁর ওহিতে বলেছেনঃ

إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً -

অর্থঃ "আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা প্রেরণ করতে যাচ্ছি।"

আর এ জন্যে আল্লাহ মানুষকে সৃজনশীল প্রজ্ঞা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে অন্য সৃষ্টির উপর তার প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

সুতরাং খেলাফতী দায়িত্বে যোগ্যতাসম্পন্ন যে সৃষ্টি তার কোন একটি অংশকে অবহেলিত রেখে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপূরক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হতে পারে না। মানব সৃষ্টির এ তথ্যটিকে উপলব্ধি করতে না পেরে তারা নিজেরাই আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাতকে দ্বিধাবিভক্ত করে শোষক এবং শাসিত হিসেবে পরিচিতি নিয়েছে। এরূপ বিভক্তকরণ প্রক্রিয়া শোষকদের স্রষ্টা সম্পর্কিত অজ্ঞতারই কারণ। আর এহেন শাসিতদের একটি অংশ কোরানপূর্ব পরিবেশে ক্রীতদাস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই দাসপ্রথার উচ্ছেদ তথা মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আল-কোরানে ওহি করা হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টি তথ্যের রহস্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়নি বলে সৃষ্টির সেরা মানুষের একটি অংশ স্রষ্টাকে অস্বীকারে এ কথা বলতে শিখিয়েছে যে, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাই যদি কোরানের উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন সেই কোরানে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে এমন একটি স্পষ্ট আয়াত হল না যে, 'আজ থেকে দাসপ্রথার প্রচলন হারাম করা হলো'।

যে কোরানে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি স্পষ্ট বৈধতা করা হলো সেখানে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে অবৈধ বিবেচনার একটি স্পষ্ট আয়াত না থাকার কারণে নাস্তিকদের চিন্তায় বিভ্রাট ঘটেছে। ঐ সব নাস্তিক, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষবাদীরাও মানবতার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে বুঝতে না পেরে তারা বলছে যে, কোরানেতো দাসপ্রথা উচ্ছেদের আয়াত নেই। অধিকন্তু দাস-দাসীদের ব্যবহারকে একটু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি আমাদের কিছু ঈমানদাররাও দাস-দাসীর ব্যবহার বন্ধ সংক্রান্ত স্পষ্ট আয়াত না থাকার ব্যাপারটি যেমন নিজেও বুঝতে পারছেন না, তেমনি নাস্তিক অথবা ধর্মনিরপেক্ষদেরকেও তারা বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই নাস্তিকরা আমাদের অজ্ঞতাকে অবলম্বন করে ধর্মকে অবমূল্যায়ন করে স্বয়ং স্রষ্টাকেই অস্বীকার করছে।

www.amarboi.org

ধর্মের যে মূল মূল্যায়নে যে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সেই বিষয়টিকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে অনুষ্ঠান সর্বস্ব নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির আলোচনা এবং আমল এত বেশী হচ্ছে যে, ঐ এবাদতগুলোর আনুষ্ঠানিকতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষকে মানবিক মূল্যবোধের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে নি। অথচ নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত মানুষকে ঐ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই ফরজ করা হয়েছিল। মানব প্রেমই এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া যেখানে শোষক ও শাসিতদের বিভক্তকরণ সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই হুজুর (সাঃ) বলেন "তোমরা তোমার সৃষ্টিকর্তাকে কি ভালবাস? তাহলে প্রথমে তোমার স্বগোত্রদের ভালবাসবে।" হুজুর (সাঃ) আরও বলেন, "কোন্ কর্ম সর্বোৎকৃষ্ট? মানুষের মনকে প্রফুল্ল করা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ক্লিষ্টকে সাহায্য, ব্যথিতের ব্যথা লাঘব ও নির্যাতিতের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তা দূর করা"।

অথচ উক্ত বাণীর বাস্তবায়ন হয় নি বলেই এ বিংশ শতাব্দিতেও পৃথিবীর আনাচে কানাচে এখনও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দাস-দাসীর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। অথচ আল-কোরান দাস-দাসীর ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করেছে। এ তথ্যই আমি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমি আমার আলোচনায় সমকালীন সমাজ প্রসংগে এমন কতগুলো তথ্য তুলে ধরবো, মুসলমানদের মধ্যে যেগুলোর মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি না থাকার কারণেই মানুষের মর্যাদা যথাযথ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। মুসলমানরাই যদি মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় তবে তা হবে তাদের জাহান্নামের কারণ। কেননা মুসলমানদেরকে তাদের আল্লাহ স্মরণ করে দিয়ে বলছেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَا اُمَّةً اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"তোমরা সর্বোত্তম দল যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। 'তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে। অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে।' (আল ইমরান- ১১০)

তাই মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা কি মুসলমানদের জন্য পাপ নয়? অবশ্যই পাপ। তাই ইসলামে কোরান শুধু দাসপ্রথাই নয়, অধিকন্তু এ প্রথার পরিপূরক হিসেবে প্রচলিত যে সকল ব্যবস্থা মানবতার অবমূল্যায়ন করেছে তার উৎখাতের জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে ইসলামী জীবনাদর্শের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছেন। তা কিভাবে করেছেন, সে তথ্যই এ বইতে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

লেখক-

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার

www.amarboi.org

মানুষ কে ও কেন

একজন নাস্তিক একদিন হজরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-কে তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি ধারণা দিতে চেষ্টা করেন। প্রশ্ন তিনটি নিম্নরূপঃ

(১) আল্লাহ্ এখন কি করেন?

(২) আল্লাহর মুখ কোন্ দিকে?

(৩) আল্লাহর পরে কি আছে?

প্রশ্ন তিনটির উত্তর দেয়ার সময় হজরত ইমাম আবু হানিফা (র ঃ) মসজিদের মেহরাবের মিম্বরে বসা ছিলেন। তাই প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইমামে আজম লোকটিকে মিম্বরে উঠে বসতে বললেন, এবং নিজে এ নাস্তিক লোকটির জায়গায় গিয়ে বসলেন এবং বললেন আল্লাহ্ এই মুহূর্তে এ কাজটি করলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাকে নিচে বসালেন এবং আপনাকে মিম্বরে বসালেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইমামে আজম একটি দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালালেন এবং নাস্তিক লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন আপনি বলুন, এ জ্বলিত শিখাটির মুখ কোন্ দিকে। নাস্তিক লোকটি উত্তর দিতে না পারায় ইমামে আজম বললেনঃ আল্লাহ্ হলেন নূর, তার কোন মুখ নেই, যেমন শিখার কোন মুখ নেই।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ইমামে আজম নাস্তিক লোকটিকে গণিতের দশম সংখ্যা হতে উল্টোভাবে একের দিকে গুণ্তে বললেন। লোকটি গুণ্তে গিয়ে একের পর কি আছে আর বলতে না পারায় ইমামে আজম তাকে বুঝালেন যে, একক সত্তার যে সূত্র সেই স্রষ্টার পরে আর কিছুই নেই।

তিনটি প্রশ্নের সামগ্রিক উত্তরের যে একক সত্তা তার সূত্র ধরেই আমাদের এগুতে হবে। তাই বলছি, আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করে নি। বরং আল্লাহই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এ সূত্র সৃষ্টির আদিকাল থেকে সত্য। তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যে

www.amarboi.org

তিনি মানুষকে সর্ব শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তাই মানুষকে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর প্রাধান্য দিয়ে তারই প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। আর এর কারণ তিনি মানুষের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত হতে চান।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির মাঝে গোপন ছিলেন। মানুষের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে চাওয়ার কারণে মানুষকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে খেলাফতের দায়িত্বে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনে আল্লাহ্ মানুষকে বিবেচনা, জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করলেন যাতে আল্লাহর ছিফাত বা গুণে মানুষ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। একটি ভাল বাড়ী বা গাড়ী করাই যথেষ্ট নয়। সেই ভাল গাড়ী বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance) এর জন্য গাইড অবশ্যই অপরিহার্য। ঠিক তেমনি আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তৈরী করেই ক্ষান্ত হতে পারেন নি। বরং শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্য তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় তিনি যে গাইড প্রণয়ন করে দিলেন তাই আল-কোরানের ইসলাম।

ইসলাম অর্থ আল্লাহ ও তাঁর বিধানের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পিত আত্মাই আধ্যাত্মিকতার চরমে আল্লাহতে পৌছার সে পরমভাবে খেলাফতী দায়িত্ব পালনের উপযোগি হতে পারে। তাদের মাধ্যমে শুধু পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায়ই নয়, বরং অন্য সৃষ্টির প্রতিও এ দায়িত্ব পালনের কারণে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তাই ইসলামের বিধি ও ব্যবস্থায় মানবতার শ্রেষ্ঠত্বই সর্বাংশে মূল্যায়িত হয়েছে। মানবতা গোটা মানুষজাতকে নিয়েই বিরাজমান এবং উহার সমস্তটাই আল্লাহর ছিফত সর্বস্ব স্বাধিকারের সন্ধানে। হাতি, গরু ইত্যাদি প্রাণীজাতির unit-এর মত মানুষজাতও একটি unit। এর অংশকে বাদ দিয়ে যেমন মানবতার মূল্যায়ন নেই এবং উহা আল্লাহর খেলাফতী দায়িত্বে আদৌ উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। আমরা যেমন বিশ্বের সমস্ত গরুজাতের একটি অংশকে বাদ দিয়ে বাকী অংশকে গরু নয় বলতে পারি না, তেমনি মানুষের একটি অংশকে ক্রীতদাস ও দাসী বিবেচনায় মানবিক মানের নিচে চিন্তা করা সমীচীন নয়। বরং এতে খেলাফতী দায়িত্বের অমর্যাদা এবং দায়িত্বহীনতাই প্রমাণ করবে।

মানুষকে আল্লাহ আশরাফুল মাখলুকাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর মানুষের আশ্রাফী বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে আল্লাহর ছিফতের বা গুণের প্রতিনিধিত্বমূলক আচার আচরণে। যেমন, আল্লাহ নিজকে রহমান এবং রহিম বলে প্রকাশ করেছেন। মানুষকেও তাঁর প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনে তাঁর সৃষ্টির প্রতি

www.amarboi.org

রহম বা দয়ার মাধ্যমেই মানবিক মূল্যায়নে সে সঠিক প্রতিনিধিত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এমনি করে আমরা যদি আল্লাহর ছিফতের عَفُوٌّ (ক্ষমাকারী) وَالِىٌّ (বন্ধু) نَافِعٌ (সুফলদাতা) صدق (সত্যবাদী) ستار (দোষ গোপনকারী) ইত্যাদি গুণাবলীর সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারি, তবেই কোরানের 'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলিফা' প্রত্যায়নের সঠিক প্রতিফলন মানুষের দ্বারা ঘটানো সম্ভব। এর বিকল্প কোন বিধান দিয়ে মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই।

একটি মানুষের একটি হাত না থাকার কারণে তাকে যেমন পূর্ণাংগ ও সুস্থ মানুষ বলা যায় না; তেমনি আশরাফুল মাখলুকাতের একটি অংশকে ম্লেচ্ছ ক্রীতদাস-দাসী বিবেচনা করে মানুষজাতকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলা হাস্যাস্পদ। অধিকন্তু আল্লাহ যাকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি করে পাঠালেন উহার মর্যাদার হানিকর একটি বিধান দিয়ে দাসপ্রথার প্রবর্তন আল্লাহর অবমাননাই হবে। তবুও মানুষ তার সৃষ্টির আদি থেকেই এহেন শোষিত প্রথায় দাস-দাসীর ব্যবহার বিধি বিধানের বিকল্পে বিবেচনা করে আসছে। এর কারণ যতগুলো হোক না কেন মূলতঃ উহা মানব মূল্যায়নেরই অভাব, যা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিষয় মানুষেরই মুর্খতা। এ মুর্খতার কারণে মানুষের ভেতরকার অহং আত্মা আত্মচেতনায় অপরকে আপন করে দেখতে পারে না। বরং তার অধীনস্তদেরকে অধিকতর শোষণের মাধ্যমে নিজের অহংএর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে উঠে এবং তখন সে ভুলে যায় স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে।

মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। ইংরেজিতে যাকে Representative বলা হয়। অভিধানিক অর্থে প্রতিনিধিকে প্রদর্শক ও দূত ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহার করা হয়। ঐ সকল শব্দগুলোর ব্যবহার স্থায়ী কোন বিষয় বা ব্যাপারকে বুঝায় না। অর্থাৎ কোন স্থায়ী শক্তির অস্থায়ী নিয়োগ ব্যবস্থাকেই বুঝানো হয় । সেই ক্ষেত্রে মানুষ অধীনস্ত এবং অস্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে বলতে হবে। খলিফা, দূত, প্রতিনিধি এবং প্রদর্শক ইত্যাদি শব্দগুলো যেমন অস্থায়ী নিয়োগ প্রসংগে ব্যবহৃত তেমনি উহার অবস্থানও একটি বিশেষ বিষয়ের বাস্তবায়নের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং অস্থায়ী নিয়োগ এবং বিশেষ বিষয়ের যৌগিক মূল্যায়নের যে মানুষ তাকে স্থায়ী কোন ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করে বিশেষ বিষয়ের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো মানে মানবতার পদস্খলন এবং এহেন পদস্খলনই প্রশ্রয় দিয়েছে শক্তিমানদের সৃষ্ট ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন।

www.amarboi.org

মানুষে মানুষে এই যে প্রভেদ উহা যেমন স্রষ্টা সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণ, তেমনি সৃষ্ট মানুষ স্রষ্টাকে তাঁর স্বনামে না ডেকে ভাষান্তরে অনুবাদে অন্য নামে ডাক্‌ছে। ভাষার বৈপরীত্যে স্রষ্টার সঠিক নাম স্মরণ না হবার কারণে যে বিভ্রাট ও বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে উহা বহুলাংশে অধীনস্তদের অধিকার হরণ করতে সাহায্য করছে।

মানুষ যিনি সৃষ্টি করলেন তার নাম আল্লাহ (الله)। শুধু সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হলেন না। অধিকন্তু মানুষের হৃৎপিন্ড الله 'নামের অংকন করে প্রতিনিধিত্বের পরিচিতি দিয়েই মানুষকে ধরাতে পাঠিয়েছেন। একজন তুর্কি ডাক্তার জনাব নূর তুর্কি মানব হৃদয়ের একাধিক হৃৎপিন্ডকে পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছেন যে, হৃৎপিন্ডের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে الله শব্দের অংকন রয়েছে। সুতরাং প্রতিনিধিত্বের পরিচিতির জন্য الله নামের মোহর হৃদয়ে সংযোজিত করে আল্লাহ হৃদয়ের আপেক্ষিক আবেদনে মানুষের ঐক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রত্যাশী। অথচ মানুষ আল্লাহ নামকে বাদ দিয়ে অনৈক্যের আলামত হিসেবে আরও কতগুলো শব্দে আল্লাহকে ডাকছে। যেমন, God, Lord, ভগবান, ঈশ্বর, খোদা ইত্যাদি। অথচ ঐ শব্দগুলো الله নামের পরিপূরক নয়। তাছাড়া সঠিক নামে আল্লাহকে না ডাকার কারণে বান্দার সে ডাকে الله সাড়া দিতে পারছেন না। আমার নাম সিরাজুল ইসলাম, যার অর্থ দাঁড়াবে 'শান্তির বাতি'। আবার ইংরেজিতে হবে Lamp of the peace। এহেন অবস্থায় কেউ যদি এর সকল অনুবাদিক নামে আমার বাড়ীতে আমাকে ডাক দেয়, তবে কি আমি ঐ নামের ডাকে সাড়া দিতে পারবো? অবশ্যই পারবো না। কারণ অনুবাদিক নামে আমার কোথায়ও পরিচিতি নেই। অর্থাৎ এগুলো আমার নাম নয়। তাছাড়া الله ছাড়া অন্য শব্দগুলোর আক্ষরিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সামগ্রিকভাবে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না।

যেমন God-এতে তিনটি অক্ষর আছে। প্রথম অক্ষর দিয়ে আল্লাহকে বুঝানো যাচ্ছে না। প্রথম অক্ষর বাদ দিলে থাকে Od-এতে কোন অর্থই হয় না। Lord এখানে চারটি অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম অক্ষর L বাদ দিলে বাকি থাকে ord-এতে কোন অর্থবোধক শব্দ হচ্ছে না। 'ভগবান' ৪টি অক্ষর; 'ভ' দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে বুঝানো যাচ্ছে না। প্রথম অক্ষরটি বাদ দিলে থাকে 'গবান'; মানে গাভি। দ্বিতীয়টি বাদ দিলে থাকে 'বান'; মানে বন্যা। তৃতীয়টি বাদ দিলে থাকে 'ন'; যার অর্থ কিছুই না। ঈশ্বরের তিনটি অক্ষরের প্রথমটি বাদ দিলে

www.amarboi.org

থাকে 'শ্বর'; অর্থ তীর। শ্বরের অন্য অর্থে মারণাস্ত্রও হতে পারে। খোদা একটি ফারসি শব্দ। সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দাঁড়াবে খোদ + আ= খোদা। অর্থাৎ যিনি এসেছেন। ঐ খোদা শব্দের 'খো' দিয়ে আল্লাহকে বুঝানো হচ্ছে না। 'খো' বাদ দিলে থাকছে 'দা' যা একটি অস্ত্রবিশেষ।

আরবীতে ঐ নামের কোন অস্তিত্ব নেই। الله একটি আরবী শব্দ। উহাতে ৪টি অক্ষর আছে। প্রথম ا বাদ দিলে থাকছে 'لله' এর মানে আল্লাহর জন্য। দ্বিতীয় 'ل' টি বাদ দিলে থাকছে 'له' যার অর্থ তাঁর জন্য অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এবং শেষ 'ل' টি বাদ দিলে থাকছে 'ه' মানে তিনি অর্থাৎ আল্লাহ। অতএব উল্লেখিত বিশ্লেষণে এখন দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র الله নামের সবকয়টি অক্ষরেই সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়া যাচ্ছে।

অথচ মানুষ ঐক্যের অবলম্বনে যে স্রষ্টার নাম উহাকে বাদ দিয়ে অনৈক্যের অনেক এবং অন্য নামে তারাতো আল্লাহকে পাচ্ছেই না, অধিকন্তু ঐ অনৈক্যের অনেক নামের অনুসারীরা নামের উপরে ভিত্তি করে আলাদা জাতি বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বহুক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে অন্যকে অধীনস্ত করে রাখতে বদ্ধপরিকর। এহেন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে গিয়ে আফ্রিকান ও আমেরিকান কালোরা সাদাদের দ্বারা নিস্পৃহীত ও নিস্পেষিত। জাতের কৌলিন্যের কারণে God, ঈশ্বর ও ভগবানের অনুসারীরা الله র অনুসারীদেরকে আদৌ বরদাস্ত করতে পারছে না। বরং আধিপত্যবাদের জাল ফেলে মুসলমানদের অধীনস্ত করার অপচেষ্টা করে আসছে। বৃহত্তর পরিবেশে বৃহৎ শক্তিধর আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, চীন, ভারত পৃথিবীর ছোট ছোট দেশগুলোর অধিবাসীদেরকে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের দ্বারা অধীনস্ত করে রেখেছে।

ব্যক্তি থেকে জাতিগতভাবে মানুষ অপর মানুষকে অধীনস্ত করে রাখার মানসিকতা ঐশ্বরিক অবদানে ধর্মের মূলনীতি নয়। তাই অমুসলমানদের কাছেও কোন যুগে, কোন দেশে অসত্য যেমন সত্য হতে পারে নাই; তেমনি আধিপত্যবাদের অসত্য দর্শন কোন যুগে কোন দেশের মানুষ নীতি হিসাবে মেনে নিতে পারে নাই। কারণ মানুষ যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-এ উপলব্ধিবোধ মানুষের সত্তায় সম্পৃক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐ ধারণাকে পাল্টাতে গিয়ে সৃষ্টির আদি হতে মানুষে মানুষে যে বিভেদ, বৈষম্য, বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তাতে মানুষ কেন এ ধারণা অনেকের কাছে আজও অস্পষ্ট। তাই তারা আল্লাহর নীতিকে বাদ দিয়ে তাদের মনগড়া নীতি দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত এবং জাতিগত আধিপত্যবাদ দ্বারা

www.amarboi.org

অন্য মানুষকে ক্রীতদাস ও দাসী, গোলাম, ভৃত্য, চাকর ইত্যাদি ম্লেচ্ছ শব্দে চিহ্নিত করে তাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার জুলুম করে চলছে। অথচ বিরোধ, বৈষম্য ও বিভেদ ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে অধীনস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বড়দের দায়িত্ব এবং উহাই মূলতঃ আল্লাহর খেলাফতী দায়িত্ব। অর্থাৎ স্রষ্টাকে মেনে নিয়ে তাঁরই নীতিতে পৃথিবীকে পরিচালিত করা।

মানুষকে আল্লাহ 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলেছেন; যার অর্থ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অথবা উত্তম সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে অবশ্যই উত্তম হতে হবে উহা বলার কোন অবকাশ রাখে না। আর যিনি সৃষ্টি করলেন তিনি যে অবশ্যই এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করতে চাইবেন উহাই স্বাভাবিক। আবার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যাকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস স্রষ্টার ঐকান্তিক ইচ্ছায়ই হবে। কারণ সেতো তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করতে চায়। আর এহেন প্রকাশের প্রয়োজনে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে অবশ্যই স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য এবং সৃষ্টিধর হতে হবে।

মনে করুন, কেউ যদি একটি মেশিন আবিষ্কার করে। আর সেই মেশিনটি যে উদ্দেশ্যে এবং যে প্রক্রিয়ায় আবিষ্কারক চালাতে চায় উহার বিকল্প প্রক্রিয়ায় যদি মেশিনটি চলে, তবে কি আবিষ্কারকের উদ্দেশ্য সফল হবে? মেশিনটির সৃষ্টি বৈকল্য উহার চাকৃতিগুলোকে অথবা যন্ত্রাংশগুলোকে এমনভাবে সংযোজন করা হয়েছে যে, ঐগুলোকে অবশ্যই ডানদিকে ঘুরতে হবে। কিন্তু মেশিনটির যন্ত্রাংশগুলো ডানদিকে না ঘুরে যদি বামদিকে ঘুরতে চেষ্টা করে তবে কি মেশিনটি চলবে? এহেন অবস্থায় মেশিনটি চালাতে গেলে উহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে উৎপাদন উহাতো সম্ভব হবেই না, অধিকন্তু মেশিনটি ভেঙ্গে গিয়ে আবিষ্কারকের অবমূল্যায়ন করা হবে। এহেন উপমার দ্বারা কি এ কথা বলা যায় না যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য মোতাবেক পৃথিবীতে চলতে না চায়, তাহলে এ মেশিনটির পরিণতির মাধ্যমে আল্লাহকেই সে অবমূল্যায়ন করবে?

উল্লেখিত উপমার উল্লেখে আমি আরও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, যে হাজারো যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে মেশিনটির সৃষ্টি, উহার একটি অংশকে বাদ দিয়েও মেশিনটি চলতে পারে না; সেখানে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ঠিক তেমনি আশরাফুল মাখলুকাতের খেলাফতী দায়িত্ব বৈকুল্যে যে সাদা-কালোর, ধনি-দরিদ্রের উঁচু-নিচুর, মালিক-ভৃত্যের বৈশিষ্ট্য উহা মূলতঃ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পরিমাপ। কেননা ঐ সাদা-কালো, ধনি-দরিদ্র, উঁচু-নিচু, মালিক-ভৃত্যের সমন্বয়ে

www.amarboi.org

সৃষ্ট মানুষ তার স্বস্ব অবস্থানে থেকেই আল্লাহর উদ্দেশ্যের অবলম্বনে সাদা-কালোদের, ধনি দরিদ্রদের, উঁচু-নিচুদের এবং মালিক-ভৃত্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পরাকাষ্ঠতা দেখাবে।

এহেন পরাকাষ্ঠতা শুধু মানুষের প্রতি নয়, বরং প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনে অন্য সৃষ্টির প্রতিও দেখাতে হবে। কারণ সে যে অন্য সৃষ্টি থেকে শ্রেষ্ঠ। আর ঐ সকল সৃষ্টিরা কেউই প্রতিনিধিত্বের যেমন দাবিদার নয়, তেমনি সেই যোগ্যতা দিয়েও তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের অধীনস্ত করে দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ খেলাফতীর দায়িত্বে কোন অভাব অনুভব না করে।

মানুষ কে এবং কেন এ উত্তরের উপলব্ধির জন্য পাঠকদের মনে এ প্রশ্নও আসা স্বাভাবিক যে আল্লাহ্ কে এবং কেন? এর উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা চলে যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন ছিফত বা গুণ সর্বস্ব একটি সত্তা, যিনি নিরাকার এবং সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে আছেন। সৃষ্ট মখলুকাতের কাছে ঐ নিরাকার সত্তার প্রতিনিধিত্ব করতে হলে মানুষকে অবশ্যই আকারে এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে হবে। আল কোরানও তাই বলছে ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً -

অর্থঃ আল্লাহর রঙ ধারণ কর। তার রঙ হতে আর কারও রঙ উৎকৃষ্ট হতে পারে? (বাকারা ১৩৮) মানুষের পক্ষে আল্লাহর রঙ ধারণ করা মূলতঃ তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং প্রকারান্তরে মানুষ জ্ঞাতে হউক বা অজ্ঞাতে হউক পৃথিবীতে সে আল্লাহর ছিফতের বা গুণের প্রতিনিধিত্বই করে।

কিভাবে মানুষ আল্লাহর খিলাফতী দায়িত্বে তাঁরই ছিফতের প্রতিনিধিত্ব করে এহেন আলোচনার আগে আমরা দেখি আল্লাহ কেন? এবং কিইবা তাঁর প্রয়োজন? এর উত্তরে একথা বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টি আছে বলেই তার একজন স্রষ্টাও আছেন। আর তাই যদি হয়, তবে সমস্ত সৃষ্টির পরিচালনায় একজন সর্বময় ক্ষমতার স্রষ্টা অবশ্যম্ভাবী নয় কি? যদি মনে করা হয় আল্লাহ বলে কোন স্রষ্টাই নেই। তবে সেক্ষেত্রে সমস্ত সৃষ্টি তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে স্বস্ব স্থানে সার্বভৌম হয়ে সংঘাতে এসে যেত। এবং তখন অধিনস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে সমস্ত সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যেত। ঐ অধিকারের প্রসংগটা শুধু মানুষের বেলায়ই নয়, বরং অন্য সৃষ্টিতেও ঐ প্রসংগ আসতে পারে। যেমন- সূর্যের অধিকার প্রতিদিন পূর্ব দিকে একটি বিশেষ সময় আকাশে ওঠা এবং অন্য সৃষ্টিকে উহার সজিবতায়

www.amarboi.org

সাহায্য করা। কিন্তু সূর্য যদি উহার অধিকার আদায়ের ব্যাপারে স্বকীয় সত্তায় সার্বভৌম হয়ে উহার অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অভ্যস্ত না হয়, তবে সেক্ষেত্রে কি অন্য সৃষ্টি আদৌ বাঁচতে পারবে?

এমনি করে আমরা যদি অন্য সৃষ্টির আলো- আঁধার, আকাশ-বাতাস, মেঘ-বৃষ্টি, নদী-সাগর, গাছ-পাতা, তরুলতা ইত্যাদি সৃষ্টির প্রতি তাকাই তবে আমরা দেখতে পাবো যে, তারা যেন কারই আদেশে স্বস্ব দায়িত্বে সমস্ত সৃষ্টিকে সজিব করে রেখেছে। অথচ উহারা যদি বলে যে, আমরা কেউই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অন্যের উপকারে ব্যবহার করবো না, তখন সৃষ্টির ব্যবস্থায় কি ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে উহা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? এহেন বিপর্যয় থেকে সমস্ত সৃষ্টিকে বাঁচাবার জন্য আমাদের সকল সৃষ্টিকেই একজন সর্বময় ক্ষমতার স্রষ্টামুখি হতে হয় নাকি? কারণ মেঘ যদি বলে যে, আমি কাউকে আমার বৃষ্টির বারিধারা দিয়ে সিক্ত ও সজিব করবো না, তখন মেঘকে বৃষ্টি বর্ষাবার জন্য হুকুম করতে পারে এমন একটি ক্ষমতাবান সত্তার প্রয়োজন হয় না কি? সুতরাং আমি মনে করি যে, সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্বের অবস্থানকে টিকিয়ে রাখার জন্য একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর প্রয়োজন আছে। আর সমস্ত সৃষ্টি যখন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের অধীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন ঐ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সম্মানে ও প্রয়োজনে অন্য সৃষ্টিকে আদেশ করার জন্য আল্লাহকেই থাকতে হয়। তাছাড়া আল্লাহ না থাকলে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যকার কথিত জাতীয় ও ব্যক্তি প্রাধান্যের প্রভাব থেকে অধীনস্তদের অভয় দেয়ার অন্য কেউই থাকে না।

মানব মূল্যায়নের মানসিকতা না থাকার কারণে ইতিহাসের পাতায় যে উত্থান পতনের উপস্থাপনা উহার সমস্তটাই অধীনস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আল্লাহরই অবদান। যখন কোন জাতি বা ব্যক্তি মূল্যায়নের ব্যর্থতা নিয়ে অধীনস্তদের কোন জাতি বা ব্যক্তিকে জুলুম করেছে, তখন আল্লাহ উহাকে বরদাস্ত করতে পারে নাই। তখন তিনি তাঁর সর্বময় ক্ষমতার দ্বারা ঐ জাতি বা ব্যক্তিকে ধ্বংস করে সেখানে নতুনের সৃষ্টি করেছেন। আর এটা শুধু একমাত্র আল্লাহর দ্বারাই সম্ভব হয়। আল্লাহ না থাকলে অধীনস্তদের অধিকার আদায় করতে অন্য কেউ যত্নবান হতেন কি? আর আল্লাহ যা কিছু করেন উহা সমস্তটাই তাঁর ছিফতেরই বহিঃপ্রকাশ, যা মানুষের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে অত্র অধ্যায়ের প্রথম অংশে আল্লাহর কয়েকটি ছিফত বা গুণের কথা উল্লেখ করেছি। ঐ গুণগুলো মানুষের পক্ষে অধিকরণ মানব মূল্যায়নের সহায়তা নয় কি? আল্লাহর গুণ হলো যে তিনি দাতা, বন্ধু, শান্তি ও মঙ্গলদাতা,

www.amarboi.org

সুফলদাতা, সৎপথ প্রদর্শক, অভাবমোচনকারী, সত্যবাদী, দোষ গোপনকারী, ক্ষমাকারী, রেজেকদাতা ইত্যাদি। ঐ গুণগুলো কোন একজন মানুষের মধ্যে অধিকরণের মাধ্যমে তিনি অধীনস্তদের প্রতি রহমশীল হয়ে আল্লাহর رَحْمٰنُ নামের প্রকাশ ও প্রতিনিধিত্বের পূর্ণাংগ পরিচয় দিতে পারে। আল্লাহর ছিফতের সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে যে গুণে উহা হলো আল্লাহ عَلِيْمًا অর্থাৎ তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী এবং এ কারণে মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানী হতে হয়।

মানুষ তার সৃষ্টির পর থেকে সৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানের গবেষণার দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টি সংক্রান্তের বিস্ময়কর বহু জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছে। আর ঐ জ্ঞানের গবেষণায় মানুষ চাঁদে গিয়েছে এবং অন্য গ্রহে পরিভ্রমণ করার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় সে সদা ব্যস্ত। জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর বিন্যাসে মানুষ আবিষ্কার করেছে বস্তুর ব্যবহারের বহু সংখ্যক ঔষধ ও শল্য চিকিৎসা সংক্রান্তের অসংখ্য বিস্ময়কর যন্ত্রাদি। মানুষ তার জ্ঞানের দ্বারা গড়ে তুলেছে আকাশচুম্বি অট্টালিকা, সৃষ্টি করেছে কৃষি উৎপাদনের কল্যাণকর কলা কৌশল। মানুষের কল্যাণের সেই সহস্র আবিষ্কারে মানুষ যেমন আল্লাহর জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছে, তেমনি ঐগুলোর ব্যাপক ব্যবহারে মানবতা খুঁজে পেয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সন্ধান। বস্তু সংক্রান্তের এতসব জ্ঞানের অবদানের পরেও মানুষ তার জীবনের আয়ুকে বাড়িয়ে দিতে পারে নাই এবং এটাই Representative বা প্রতিনিধিত্বের প্রমাণ। এরপর মানুষকে আবার ফিরে আসতে হবে আল্লাহর কাছে। তখন সেখানে আল্লাহ কারও ব্যক্তিত্বের বিচার করবেন না। শুধু দায়িত্বের বিচার করবেন। সুতরাং ব্যক্তির কৌলিন্য দিয়ে দায়িত্বের যথার্থতা প্রমাণিত না হলে পরকালীন শাস্তি অবধারিত।

মনে রাখতে হবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খেলাফতী দায়িত্বে মানব মূল্যায়নের অভাব ঘটলে উহা শুধু মানুষকেই ক্ষতি করে না; বরং উহার স্রষ্টাও তাঁর সৃষ্টির কাছে সঠিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। অথচ আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রকাশ করাই হচ্ছে খেলাফতী দায়িত্বের মূল মূল্যায়ন। সুতরাং যে মানুষের মাধ্যমে আল্লাহর এহেন প্রকাশ উহাদের মধ্যকার বিপর্যয় আল্লাহর প্রকাশে ব্যাহত ঘটে। তাই যে বৈষম্যকে নিয়ে বিরোধ উহাকে সমূলে উৎখাত করার জন্যে যুগে যুগে আল্লাহ তার মনোনীত নবী রসূলগণ পাঠিয়ে অধীনস্তদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা তাদের শিক্ষার দ্বারা পৃথিবী হতে অধীনস্তদের এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতি সাময়িকভাবে করতে পারলেও তাঁদের

www.amarboi.org

অনুপস্থিতিতে অধীনস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ঐ সকল নবী রসূলগণ তাঁদের শিক্ষায় এবং তাদের সমকালীন আমলে তাঁরা ভুল করেন নাই। অথচ তাঁদের পরবর্তীকালে বিশেষ করে হুজুর (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে ক্রীতদাস-দাসীদের ব্যবহার মানবতার বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অবহেলিত মানবগোষ্ঠি যখন প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখনই মানবাধীকারের (Human Rights) বিপর্যয়ের বিষয় এবং অধিকার আদায়ের জন্য আলোচনা আসে। সেই আলোচনায় আলোচ্য বিষয়ের ঐতিহাসিকভাবে মানুষের অধিকার কোথায় এবং কিভাবে পদদলিত হয়েছে এ সকল তথ্যের আংশিক উপস্থাপনায় প্রথমে আমরা ক্রীতদাস ও দাসীদের ব্যবহারে তাদেরকে দেয়া সীমিত অধিকার নিয়ে আলোচনায় আসবো।

মানবতার জন্য কলংকময় ক্রীতদাস প্রথা

মানুষ কি ও কেন এ প্রশ্নের উত্তর যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়, তবে বৈষম্যের বিভ্রান্তিতে মানবগোষ্ঠীর একটি অংশকে ক্রীতদাস জ্ঞানে অবহেলিত ও অবাঞ্ছিত গোষ্ঠী ভাবার অবকাশ থাকতো না। মানবতার মর্যাদার মূল্যায়ন না হবার কারণে অবক্ষয়ের যে অভূত অভিলাষ চরিতার্থ করা হয় উহার মধ্যে স্বাধীন মানুষকে পরাধীন করা অন্যতম প্রধান। একটি মানুষ আর একটি মানুষকে তার গোলাম করে রাখবে এবং প্রয়োজনবোধে তাকে গরু-ছাগলের মত হাটে-বাজারে বিক্রি করবে এটা সৃষ্টির জন্য যেমন অস্বাভাবিক তেমনি আল্লাহর জন্য অসহনীয়।

আল্লাহ সৃষ্টিকূলের অন্য সৃষ্টির মধ্যে একটি গাছ অন্য একটা গাছকে পরাভূত করে উহাকে পরাধীন করে রাখতে দেখা যায় না। প্রাণীকূলের পশুপাখীদের বিচরণক্ষেত্রে হাজারো পশুপাখীরা তাদের বিচরণ ভূমিতে সমঅধিকারে ন্যায্য খাবারে সহঅবস্থান করে আস্ছে। নদী ও সাগরের অতলতলে অবস্থান করে আস্ছে যে সকল মৎস্যকূল তারা কেউই তাদের স্বগোত্রীয়দেরকে পরাভূত করতে শেখেনি। প্রকৃতির এ সৃষ্টি রহস্য যিনি পরিচালনা করেন, তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে অন্যভাবে সৃষ্টি করবেন এটা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং আল্লাহ মানুষকে অন্য সৃষ্টি থেকে আলাদা করে অধিকতর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে সৃষ্টি করলেন যাতে সে

www.amarboi.org

তার স্বগোত্রীয়দের সহ-অবস্থানে সজাগ থাকতে পারে। অধিকন্তু শয়তান তথা অন্যায়ের ধারণা সৃষ্টি করে বিভ্রান্তির অবকাশ রেখে দিলেন যাতে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা যায়। এর পরেও আল্লাহ লক্ষাধিক নবী রসূল পাঠিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত পথকে পরিহার করার শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে ভাল রাখার আল্লাহর সর্বপ্রকার সুপ্রচেষ্টা সুন্দরের জন্য মূল্যায়িত হবে এটাইতো মানুষের জন্য কাম্য হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু মানব মূল্যায়নের মানসিকতা না থাকার কারণে আমরা সুন্দরের পরিবর্তে অসুন্দরের এবং অধর্মের অভিব্যক্তিই দেখতে পাচ্ছি। এহেন অসুন্দরের অবস্থান অবক্ষয়জনিত কারণে মানুষের একটি বিরাট অংশকে অমর্যাদাশীল রেখে মানুষ কি তার জাতীয় সত্তার কলংকিত করছে না? কি করে একটি মানুষ আর একটি মানুষকে হালের বলদ জ্ঞানে কৃষিকাজে এবং অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে হাটে-বাজারে গরু-ছাগলের মত বিক্রি করে উহা আমি বুঝে উঠতে পারি না। যেখানে গরু ও গাধাকে আল্লাহ কৃষি কাজের সহায়ক করে তৈরী করলেন, সেখানে একটি মনিব মানুষ অন্য একটি মানুষকে কৃতদাস জ্ঞানে গরু ও গাধার কাজ করায় এবং প্রয়োজনবোধে উহাকে হাটে-বাজারে বিক্রি করে। এহেন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নবীদের আগমণ ছিল না।

সৃষ্টির বৈকুল্যে স্রষ্টা মানুষকে বৈপরীত্য দিয়ে সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, লম্বা-খাটো ইত্যাদি করে তৈরী করেছেন সত্য, কিন্তু এগুলোর কারণে বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি কাম্য নয়। বরং ঐ বৈপরীত্য পরস্পরের পরিচিতির প্রয়োজনেই দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর সকল মানুষকে যদি একটি রং ও রূপে তৈরী করা হতো, তখন পরিচিতির প্রশ্নে যে বিভ্রান্তি ঘটতো উহা সামলানো সম্ভব হতো কি? যমজ সন্তানের সামান্য একটু মিলের কারণে বহুক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে চিনতে না পেরে বহু কেলেংকারির খবর হয়েছে।

শুধু আকারেই নয় বরং মানুষের মন ও মানসিকতার বৈপরীত্য সৃষ্টি করে রুচির যে প্রভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে বস্তুর মূল্যায়ন বিভিন্ন লোকের কাছে ভিন্নতর হতে বাধ্য হয়েছে। সুন্দরের ব্যাপারে যদি একই সুন্দরের অনুভূতি থাকতো, তখন কালোকে সুন্দর বলা কাউর পক্ষে সম্ভব হতো কি? খাদ্যের ব্যাপারে একই খাদ্য যদি সকল লোকের রুচিমত হতো তবে খাদ্যের অফুরন্ত ভান্ডার অপব্যবহারে অন্যরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না কি? সর্বশেষ কথা হলো যে, ঐ বৈপরীত্য না থাকলে মানুষের পক্ষে স্রষ্টার রহস্য ও মহত্ত্ব বুঝা আমাদের

www.amarboi.org

পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না। সুতরাং বৈপরীত্য বৈষম্যের কারণে নয়, বরং বৃহত্তর বিবেচনায় মানবকল্যাণেই উহার সৃষ্টি। তাই কল্যাণের বিবেচনায় না গিয়ে বৈষম্যের বিবেচনায় পরিবেশকে ঘোলাটে করে মানবতার অবমূল্যায়নে যে ক্রীতদাস এবং ম্লেচ্ছ মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে উহা স্রষ্টার সাথে আজ এত সংঘাত সৃষ্টি করছে যাতে মানবগোষ্ঠী বস্তুবাদী সভ্যতার চরমে উঠেও শান্তি পাচ্ছে না।

বৈষম্যের ধারণা একটি শয়তানী সত্তার ধারণা। মানুষ সৃষ্টি করে আল্লাহ যখন আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেস্তাদের হুকুম দিলেন তখন শয়তানই প্রথম বৈষম্যের বিবেচনায় একজন অহংকারী হিসেবে আদমকে সেজদা দিতে অস্বীকার করেছিল এ কারণে যে, সে আদম হতে শ্রেষ্ঠ, আগুনের তৈরী। অথচ শয়তান না ফেরেস্তা ছিল, আর না তাকে আদমকে সেজদা করতে বলা হয়েছিল। এহেন অযাচিত পরিবেশের পেছনে আল্লাহর যে রহস্য উহা হলো শয়তানী সত্তা থেকে সত্যকে আলাদা করে শেখা, যা প্রকারান্তরে আদমের মর্যাদারই কথা। আলোর মূল্যায়ন যেমন অন্ধকারে, তেমনি বৈপরীত্বের মূল্যায়ন ঐ বৈষম্যে। মানুষ সৃষ্টির এ রহস্যকে বুঝতে না পেরে বৈপরীত্যকেই বৈষম্য বিবেচনায় বিভেদের অবকাশ দিয়েছে। তা না হলে কি করে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে ক্রীতদাস জ্ঞানে তার সাথে পশুর মত ব্যবহার করে? ম্লেচ্ছ বা ক্রীতদাস জ্ঞানে যাকে অহরহ আমার পাশে রাখছি, তার চাওয়া পাওয়ার আবেদন কি আপেক্ষিক না অধিকার? প্রেম-ভালবাসা, খাদ্য, পিপাসা, অবসর বিনোদন এবং দুঃখ-বেদনার অনুভূতি ক্রীতদাস ও মনিবকে যখন স্বতন্ত্রের শিক্ষা দেয় না, তখন ঐগুলোর অধিকার থেকে কথিত ম্লেচ্ছদেরকে বঞ্চিত করা মানে তাদের প্রতি চরম জুলুম, যা কোন অবস্থায়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

একটি স্বাধীন মানুষের জীবনের পূর্ণাংগতার জন্য তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। কিন্তু ক্রীতদাসদের বেলায় উহার কোন একটিরও অধিকার প্রতিষ্ঠার অবকাশ ছিল না। কখন থেকে, কিভাবে এবং কেন যে একটি মানুষ আর একটি মানুষের ক্রীতদাস ও দাসী হয়ে গেল উহার শুরুর ইতিহাস না থাক্‌লেও রোমীয় ও পারস্যের কথিত সভ্যতায় ক্রীতদাস-দাসীদের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। কোরান-পূর্ব মিসর ও আরবের অন্যান্য দেশেও অমানবীয় ক্রীতদাস ব্যবস্থার ব্যাপকভাবে প্রচলন ছিল। ক্রীতদাস সংক্রান্ত সামাজিক ব্যাধি মূলতঃ দুইটি দৃষ্টিভংগি থেকে সৃষ্ট। উহার একটি হচ্ছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় স্বীকৃত বংশানুক্রমে বস মেনেছে এমন একটি গোষ্ঠী,

www.amarboi.org

যারা উত্তরাধিকারী সূত্রে মালিকের সম্পদ হিসেবে ভোগ ও ব্যবহার হয়ে আসছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যুদ্ধে লব্ধ যুদ্ধবন্দিদের একটি অংশ যারা বিজয়ীদের হাতে এসে ক্রীতদাসের মর্যাদা পায়। পরবর্তীকালে এদের বিনিময় না হলে এরাও বিজয়ীদের মালিকানায় ক্রীতদাস হিসেবে জীবন যাপন করে এবং বিজয়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে এক সময় বংশ পরম্পরায় তাদের মূল সত্তা হারিয়ে বিজয়ীদের হাতের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। ঐ উভয় অবস্থায় ক্রীতদাস মানুষগুলোকে মনিবরা তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে হাটে-বাজারে বিক্রি করে তাদের প্রয়োজন মিটাতো। ঐ বিক্রির ব্যাপারে এমন অমানুষিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো যা এতই হৃদয়বিদারক যে উহা ভাবতেও মন শিহরিয়া উঠে। বংশানুক্রমে প্রাপ্ত একটি ক্রীতদাস পরিবারের স্ত্রী-পুত্র ও স্বামী নিয়ে যে সংসার উহা হতে মালিক প্রয়োজন মনে করলে সন্তানটি একজনের কাছে এবং সন্তানের মাকে একই হাটে অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে দিত। বহুক্ষেত্রে মাকে অথবা দুগ্ধ পাষ্য শিশুকে দুইজন ভিন্ন লোকের কাছে বিক্রি করে দিত যাতে মা সন্তানহারা এবং শিশুটি মাতৃহারা হয়ে পড়তো। মানবতার জন্য এমনতর কলংকময় অবস্থা আর কি হতে পারে।

বহুক্ষেত্রে বাজার থেকে ক্রীতদাসী ক্রয় করে মনিবরা তাদের সাথে যৌন মিলন করতো। এটা তাদের একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। বহু যুদ্ধ ঐ সময় একারণেই হতো যাতে পরাজিতদের সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদেরকে বিজয়ীরা ভোগ করতে পারে। এহেন ভোগের ব্যাপারেও মালিক বা মনিবরা 'আজল' নামক এক অমানবিক প্রক্রিয়ায় ক্রীতদাসীদেরকে যৌন মিলনের সাধ থেকে বঞ্চিত করে দিত। ঐ আজল প্রথার দ্বারা মালিকরা তাদের যৌনসাধ পরিতৃপ্তির সাথে সাথে তাদের পুরুষাংগকে তুলে নিয়ে বীর্যটুকু স্ত্রীঅঙ্গের বাইরে ফেলে দিত। এটা তারা এ কারণে করত যাতে ক্রীতদাসীদের পেটে সন্তান ধারণ না করতে পারে। কারণ সম্পত্তিতে সন্তানটির উত্তরাধিকারী হওয়া মালিকরা ভাল মনে করতো না। যদি ক্রীতদাসীদের পেটে মনিবদের বীর্যে এহেন সন্তান প্রসব করা হতো তখন সন্তানকে মনিবরা বিক্রি করে দিত। অথবা প্রয়োজনবোধে ঐ দাসীকে অন্যত্র বিক্রি করা হতো। ঐরূপ ক্রীতদাসীকে আরবী ভাষায় ঐ সময় 'উম্মে ওলাদ' বলে অভিহিত করা হতো। ইসলামের নবী (সাঃ) এসে এ ধরনের বিক্রিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ (সাঃ) -এর আগমনের পূর্বে ঐ সকল ক্রীতদাস-দাসীদের অবস্থা এমনও ছিল যে একটি ক্রীতদাস বা দাসীর একাধিক মালিক ছিল। শরীকরা

www.amarboi.org

যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের ওয়ারিশ হতো, ঠিক তেমনি ক্রীতদাসীদের যেহেতু সম্পদ জ্ঞান করা হতো, সেহেতু তারা ওয়ারিশদের অংশ হয়ে যেত। এভাবে কোন একটি দাসের একটি অংশ যদিও বা আজাদ হয়ে যেত, তখন অন্য অংশীদারের অধিকার হতে তারা মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত ক্রীতদাসরা আজাদ হতে পারতো না। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বে পৃথিবীর যে শহরগুলোতে কথিত সভ্যতার জোয়ার এসেছিল, সেখানেই ক্রীতদাস-দাসীদের ব্যবহার এতই জঘন্য ছিল যে, উহার সংকলিত ইতিহাস আর একটি আলাদা পুস্তকে পরিণত হবে।

ক্রীতদাসদাসীদের অবস্থা প্যাগান সমাজে যে অমানবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে ততটা খৃষ্টান অথবা মুসলিম সমাজে ছিল না। কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধে এরা কিছুটা সজাগ ছিল। বিশেষ করে ইসলাম তো ক্রীতদাস প্রথাকে একেবারে তুলেই দিয়েছে। তবে ইসলামের অর্থাৎ কোরানের আবির্ভাবের পূর্বে প্যাগান সমাজ থেকে খৃষ্টান সম্রাটদের কাছে যে দাস প্রথা আসে তাতে দুটো বিদ্রুপাত্মক বৈশিষ্ট্য ছিল। এর একটি ছিল দাসদের বিবাহের আইনগত স্বীকৃতির অনুপস্থিতি এবং অপরটি ছিল তাদের উপর মনিবদের অত্যাচার করার অধিকার। জাস্টিনিয়ানের আগে খৃষ্টান সম্রাটগণও এ বিষয়টির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। কনস্টানটাইন অবশ্য দাস পরিবারকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলাকে নিষিদ্ধ করেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন দাসত্ব মোচনের পবিত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে। ঐ আইন অনুযায়ী দাসত্ব মোচন কাজ অনুষ্ঠিত হতো গীর্জাতে এবং প্রতি রবিবারে ইহুদী মনিবদের হাত থেকে খৃষ্টান দাসদেরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কিছু পদক্ষেপও নেয়া হয়। দুতিন ক্ষেত্রে দাসদের মুক্তি দেয়া হয়েছে এ শর্তে যে তারা তখন সমাজ ব্যবস্থার অপরাধীদের খোঁজখবর দেবে। স্বাধীন এবং দাসশ্রেণীর মধ্যে বিয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এ ধরনের কোন অপরাধের খোঁজ দিলেও বহুক্ষেত্রে দাসদের মুক্তি দেয়া হতো। একজন স্বাধীনা স্ত্রীলোক তার সাথে যৌন কাজ করলে কনস্টানটাইনের নির্দেশ ছিল স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করতে হবে এবং দাসটিকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলতে হবে। পাঠকরা এবার ভেবে দেখুন, একটি মানবগোষ্ঠী একই ধরনের আর একটি মানবগোষ্ঠী দ্বারা কিভাবে নির্যাতিত হতো।

খৃষ্টাব্দে দাস প্রথা বৈধ প্রতিষ্ঠানরূপে টিকে থাকে এবং খৃষ্টাব্দ একে স্বীকৃতি দেয়। তবে গীর্জার শাস্তিদান আইনে একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং দাসের প্রতি কৃত অপরাধের মাঝে পার্থক্যকরণকে অস্বীকার করা হয়েছে। মঠবাসীদের মত

www.amarboi.org

দাসদের জীবনের সাথে দারিদ্র এবং শ্রমকে যুক্ত করে তাদের প্রতি একটি নৈতিক মর্যাদা আরোপ করা হয়েছে শুধু।

খৃষ্টান সমাজের মনিবরা গভীর ঘৃণার দৃষ্টিতে দাসদের দিকে তাকাতো। তখন খৃষ্টবাদ দূর করার জন্য নৈতিকতা উজ্জীবনের এমন এক আন্দোলন শুরু করে যা দাসদের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে থাকে। দাস মুক্তিকে তখনকার সমাজে কর্তব্য মনে করা হতো না বটে, তবে একে অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার একটি উপায় বলে মেনে নেয়া হতো। এহেন নৈতিকতার উপরে ভিত্তি করে সেন্ট ঘেলানিয়া আট হাজার দাসকে মুক্তি দেন। গালেব সেন্ট ওভিডিয়াস পাঁচ হাজার, ডায়োক্লিটিয়ানের যুগের রোমান প্রিফেকটস ক্রোমোটিয়াস এক হাজার চারশো এবং টোজানের শাসনকালের একজন প্রিফেকটস হার্মিস এক হাজার ছয়শত পঞ্চাশজন দাস মুক্ত করেন। পোপ সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট আগাষ্টাইনের অধীনস্ত পুরোহিতগণ এবং অন্য ব্যক্তিবর্গ পুণ্য লাভের আশায় তাদের দাসদেরকে মুক্ত করে দিতেন। জাতীয় বা ব্যক্তিগত শোক্‌রিয়া আদায়ের দিনে, রোগ মুক্তির পরে, সন্তানের জন্ম উপলক্ষে এবং মৃত্যুলগ্নে দাস মুক্তি করাটা ঐ সময়কার সমাজে রেওয়াজ ছিল। অনেক সনদ এবং স্মৃতিস্তম্ভ উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, মধ্য যুগে বহু ব্যক্তি আত্মার কল্যাণ হাসিলের জন্য তাদের দাসদেরকে মুক্ত করে থাকতেন। অবশ্য কনস্টাইনটাইনের পরেও ইউরোপে আটশো বছর পর্যন্ত দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। এর ব্যবহার ধর্মীয় আচরণে কিছুটা পাল্টালেও প্যাগান যুগের চেয়ে খৃষ্টীয় যুগে দাসদের সংখ্যা কমেনি, বরং বাড়ছে।

প্যাগান যুগের মানুষ কোন ধর্মীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিল না। সুতরাং মানব মূল্যায়নের পেছনে যে পরকালীন জীবনের উৎসাহ উহা প্যাগান সমাজে না থাকার কারণে এবং আল্লাহর অস্তিত্বের অজ্ঞতায় দাসপ্রথা একটি অমানবিক আকার ধারণ করাটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু ইসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পরে খৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠায় খৃষ্টান সমাজ কি করে এ দাসপ্রথাকে প্রচলিত রেখেছে তা আমার ধারনায় আসে না। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগে ইহুদী এবং খৃষ্টান সমাজে দাসপ্রথার প্রচলিত ব্যবস্থায় বহু দাসকে মনিবের হালের বলদ হিসেবে কায়িক ও কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে হতো। কথিত সভ্যতার অবগুণ্ঠনে আজও খৃষ্টবাদ ইউরোপ ও আমেরিকাতে দাসপ্রথার প্রচলনকে মুছে দিতে পারেনি, যেমনটি পেরেছে মুসলিম সমাজে। আজ মুসলিম সমাজে দাসপ্রথার

www.amarboi.org

প্রচলন নেই বললেই চলে। তাদের মধ্যে বিকল্প ব্যবস্থায় যে অবৈধ বিষয়ের ব্যবহারিক প্রচলন রয়ে গেছে উহা হলো জাত প্রথার ব্যাপক বিভেদ। পাশ্চাত্যের খৃষ্টসমাজে জাতের অথবা কৌলিন্যের কারণে অন্যকে ম্লেচ্ছ ভাবার ততটা অবকাশ না থাকলেও বৃহত্তর পরিবেশে ভৌগোলিক প্রাধান্যে সাদা-কালোর বিবেচনা তাদেরও আছে। বিলেতে হাউজ অব লর্ডস এবং হাউজ অব কমনসের মধ্যে লর্ডসদের কৌলিন্যের কারণগুলো বিশেষভাবে বিবেচিত হচ্ছে। ঐ বিবেচনা অর্থের ও সমর্থের আধিপত্যের কারণে, কোন আদর্শিক কৌলিন্যের কারণে নয়। বিশেষ করে সাদাকর্তৃক কালোদের উপেক্ষণ নেহাত অবাঞ্ছিত এবং স্রষ্টার উদ্দেশ্যের অবমূল্যায়ন। অর্থ ও সমর্থ যদি কালোদের হাতে থাকতো তবে হয়তো বা তারাও সাদাদেরকে ম্লেচ্ছ ভাবার অবকাশ পেত। এহেন বিবেচনায় তারা সাদা-কালোর স্রষ্টাকেই পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করছে। কিন্তু এ বিবেচনায় তারা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করছে না। সাদাদের দ্বারা কালোরা কিভাবে নির্যাতিত হতো উহার একটি উপমা উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বলা হয়েছে সব মানুষ সমান। কিন্তু সে দেশে কালো মানুষকে কুড়াতে হয় সাদা মানুষের ঘৃণা এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে আমেরিকার কোন পত্রিকা তার পাঠকদের জিজ্ঞেস করেছিল 'হিটলারের যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে কি শাস্তি হওয়া উচিত? এর উত্তরে একজন আমেরিকান নিগ্রো মহিলা বলেছিল, হিটলারের গায়ের রং কালো করে তাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া উচিত হবে। অর্থাৎ মেয়েটি বলতে চেয়েছে যে আমেরিকাতে নিগ্রো কালোরা কালো হবার কারণে যেভাবে নির্যাতীত হয় এ ধরনের নির্যাতনই হিটলারের শাস্তির জন্য যথেষ্ট।

বর্তমান বিশ্বের প্রাচীন ও সনাতন ধর্মের অধিকারী ১০০ কোটি মানুষের দেশ ভারতে জাতের ও মতের এত বিভেদ বিদ্যমান উহা কোন অবস্থায় মানবতার অনুকূলে নয়। ভারতের সংবিধানেও সকল ধর্মের মানুষের স্বাধীনতার কথা স্বীকৃত আছে। বলা হয়েছে সব মানুষের সমান অধিকারের কথা। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেদেশের মুসলমানদের সেই আমেরিকার নিগ্রোদের মত নির্যাতিত হতে হচ্ছে। তাই আজ দেখছি নির্যাতনের চরমে রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে ভারতের হিন্দুরা অযাচিতভাবে অসংখ্য মুসলিম নিধন করছে। ইতিপূর্বেও অসংখ্য উছিলায় কয়েক হাজার দাঙ্গাকারী দিয়ে বহু মুসলমানকে হত্যা ও ভিটেছাড়া করেছে। ঐ জাতগুলোর মধ্যে হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগোষ্ঠীকে

www.amarboi.org

বর্ণহিন্দুরা মানবতার মানদণ্ডে বিচারই করে না। এ প্রসঙ্গে এস এ সিদ্দিকী কর্তৃক লিখিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ভারতীয় দলিত হরিজনদের নেতা ডঃ বি, আর অম্বেদকরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ডঃ অম্বেদকর ১৯৩০- ৩১ সনে বিলেতের এক গোল টেবিল বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, '১৯৩০ সালে একদল হরিজন রাজপুতদের মত পোশাক পরিয়ে তাদের এক বরকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিল। বর্ণহিন্দুরা এটাকে অচ্ছুতদের ধৃষ্টতা হিসেবে গণ্য করে তাদের প্রতি ১১টি নির্দেশ জারি করেছিল। যেমন-

১. হরিজনরা হাঁটুর নিচে কাপড় পরতে পাররে না।
২. কোন হরিজন রমণী স্বর্ণালংকার পরিধান করতে পারবে না।
৩. মেয়েরা তামা বা পিতলের পাত্রে পানি বহন করতে পারবে না। তারা কেবল মাটির কলসি ব্যবহার করবে।
৪ হরিজনদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে পারবে না।
৫. হরিজনদের ছেলেমেয়েরা কেবল বর্ণহিন্দুদের পশু চরাবে।
৬. হরিজন নারী ও পুরুষরা বর্ণহিন্দুদের দাস হিসেবে কাজ করবে।
৭. হরিজনরা কোন বর্ণহিন্দুদের নিকট হতে জমি ইজারা নিয়ে চাষাবাদ করতে পারবে না।
৮. বর্ণহিন্দু জমিদারদের কাছে হরিজনরা নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে পারবে। অন্যথায় সেচের জন্য তাদের কোন পানি দেয়া হবে না।
৯. সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুরুষরা এবং মেয়েরা প্রায় অনাহারে মিরাসদার বর্ণহিন্দুদের কুলিগিরি করবে।
১০. অনুষ্ঠানাদিতে ভারতীয় কোন সংগীত ব্যবহার করা চলবে না।
১১. বরযাত্রা বা বিবাহ মিছিলে ঘোড়া ব্যবহার করা যাবে না। শুধু তাদের ঘরের দরজা পাল্কী হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। কোন অভিপ্রায়েই হরিজনরা যানবাহন ব্যবহার করতে পারবে না।

পাঠকগণ, একবার ভেবে দেখুন কি নীতির নির্দেশনা দিয়ে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠজীবকে পদদলিত করে চলেছে। অথচ একজন স্রষ্টার হাতে ঐ হরিজন ও হিন্দুদের সমউপাদানে সৃষ্ট। বর্ণহিন্দুদের এহেন বিমাতাসুলভ আচরণের পেছনে এমন কোন কৌলিন্যের কারণ বিবেচনা করার অবকাশ আছে কি? বর্ণহিন্দুদের দ্বারা হরিজনদের প্রতি এহেন বৈষম্যপূর্ণ আচরণ দেখে ভারতের একজন নামকরা সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার কর্তৃক লিখিত Why Harijon Embrace

www.amarboi.org

Islam নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বর্ণহিন্দুদের অমানবিক আচরণই হরিজনদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। কারণ হরিজনরা ইসলামের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মানবতার ও ভ্রাতৃত্বের মূল্যায়ন।

কুলদীপ নায়ারের মন্তব্যের পেছনে তিনি যে বাস্তবতা অবলোকন করেছেন তাতে তিনি হরিজনদেরকে বর্ণহিন্দুদের আপনজন হিসেবে দেখতে পান নি। তার মতে ভারতীয় বর্ণহিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, হরিজনরা ইতর শ্রেণীর মানুষ। সভ্য সমাজের সাথে হরিজনদের উঠাবসা উচিত নয়। কুলদীপ নায়ার দেখেছেন যে, শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে বর্ণহিন্দুরা হরিজনদের বিভিন্ন কায়দায় অত্যাচার করে আসছে। হরিজনরা যতই ক্ষুধার্ত থাকুক না কেন হোটেলে তারা খেতে বসতে পারে না। তাদের সেলুনে ঢুকতে পারে না। তাদের সেলুনে ঢুকতে দেয়া হয় না। বর্ণহিন্দুরা হরিজনদের সাথে কোন জিনিসপত্রের বেচাকেনা করতে রাজি নয়। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে হরিজনরা যখন মানবসুলভ অধিকার ফিরে পায়, তখন ধর্মান্তরের সংখ্যা বাড়তে বাধ্য। কি করে একজন ব্রাহ্মণ ধর্মের দোহাই দিয়ে আর একজন একই রক্তমাংসের মানুষকে অচ্ছুত ভেবে অবজ্ঞা করে? এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, মানুষ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং উহার স্রষ্টার মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণরা বুঝতে পারে নি। অচ্ছুতদের অবশিষ্ট একটি উপস্থাপনা বিকল্প ব্যবস্থায় অন্যভাবে বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলের অবস্থান থেকেও উল্লেখ করা যেতে পারে। এবং উহা আমি আমার অত্র পুস্তকের "বিকল্পে বর্তমান সমাজ" অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

www.amarboi.org

বিকল্পে বর্তমান সমাজ

ইতিপূর্বে মানুষ কে? এবং কিভাবে সে ক্রীতদাস হলো এর আলোচনাসহ কলংকময় ক্রীতদাস প্রথার অমানুষিক অবস্থার উপস্থাপনা করেছি। কিন্তু বিকল্পে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার যে বিষয়টিকে তুলে ধরতে চাই উহা হলো কিভাবে মানবতা এখন অন্যভাবে এবং অন্যনামে ঐ ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন করে চলছে। পৃথিবীর কোথায়ও আজকে গরু ছাগলের মত হাটে-বাজারে ক্রীতদাস বেচাকেনা হচ্ছে না সত্য, কিন্তু আদম ব্যবসার নামে এক ধরনের ব্যবসা স্বীকৃতভাবে পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। ঐ ব্যবসায় নিয়োজিত দালালরা অর্থের বিনিময়ে সমাজের উচ্ছিষ্ট, অবহেলিত, অশিক্ষিত এবং অবলা নারীদেরকে একদেশ হতে অন্যদেশে কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করে একটি মোটা অংকের অর্থ অর্জনে তারা সক্ষম হয়েছে। যে দেশে এবং যাদের হাতে এই অবহেলিত আদমদেরকে অর্থের বিনিময়ে তুলে দেয়া হচ্ছে, তারা তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রাপ্ত আদমদেরকে অযাচিতভাবে তাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্যে এমনভাবে ব্যবহার করছে যে, মানবিক পর আজ অবমূল্যায়নে ঐ পাচারকৃত আদমরা নব্যদাসে নবরূপে নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত।

পাচারকৃত নারীদেরকে ভিনদেশের হোটেল রেস্তোরাঁয় খদ্দেরের খোরাক হিসেবে দেহ বিক্রি করতে হচ্ছে। কারণ নব্য মনিবদের ব্যবসায় বিশেষ সাফল্য যাতে ব্যাহত না হয়। শুধু বিদেশে নয়, বরং দেশেও এহেন বিক্রির ব্যবস্থার প্রচলন আছে। তবে সারাজীবনের জন্য না হলেও কয়েকটি রাত্রের জন্য ঐ ব্যবসার ব্যবস্থা বিদ্যমান। ভিনদেশে পাচারকৃত আদমরা মূলতঃ সমস্তটাই অনুন্নত দেশের অশিক্ষিত জনশক্তি, যারা নিজ দেশে কর্মসংস্থানের করণীয় কিছুই করতে পারে নি। আর এ জন্য অনুন্নত দেশের সমাজ এবং সরকারই প্রধানতঃ দায়ী। অল্প মজুরীতে অধিক উৎপাদন উন্নত দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর একমাত্র চাবিকাঠি হিসেবে তারা অনুন্নত দেশে দালাল পুষছে যাতে আদম পাচারে তারা পাশ্চাত্যের শিল্পকে শক্ত ও সমৃদ্ধশালী করতে পারে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের মত উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলোর মানুষদেরকে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিদেশে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে তারা সেখানে নিজেরাই নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে।

www.amarboi.org

তাকওয়া ও পরহেজগারী এবং কর্মের কারণে মানুষের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের পার্থক্যের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির প্রভাবে মানুষ একে অপরকে গোলাম বা পশুজ্ঞানে অবমূল্যায়ন করবে এটাতো স্বয়ং স্রষ্টার সাথেই সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ সৃষ্টিকারক যে যে উদ্দেশ্যে এবং নীতি নির্ধারণে মানুষের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করে দিলেন তার বিপরীত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মানব রচিত নীতি কি স্রষ্টার সমর্থনপুষ্ট হতে পারে? তাছাড়া মানুষ আল্লাহর খলিফা হবার কারণে যে মর্যাদায় সে প্রতিষ্ঠিত তাকে তারই সৃষ্টি মানুষ অমর্যাদাশীল করবে উহা তো আল্লাহর উদ্দেশ্যের পরিপূরক নয়।

সমস্ত মানুষ একই আদম হাওয়া থেকে সৃষ্টি। সৃষ্টির আদি থেকে সমস্ত মানুষের চাওয়া পাওয়ার আবেদন একইভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। রক্ত-মাংস, ইচ্ছা- বাসনা, প্রেম-ভালবাসা, ক্ষুধা-পিপাসা, শীত ও গ্রীষ্মের অনুভূতি সৃষ্টির আদি থেকে যখন প্রতিটি মানুষের সহজাত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন তাদের কোন কৌলিন্যের কারণে একটি মানুষ অন্য একটি মানুষকে নীচ জ্ঞানে হীনমন্যতার পরিচয় দেয়? তাদের অথবা তাদের পূর্ব পুরুষদের কি ধরনের কৌলিন্যকর কর্ম ছিল উহার পরিচয় তার উত্তরসুরিদের আমলে পরিচয় বহনকারী কোন সুকর্ম না থাকলে নেহাত অর্থনৈতিক অভিলাষই কি মানুষের কৌলিন্যের মানদন্ড হতে পারে? যে আল্লাহ একই উপাদান দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করলেন এবং শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে তাকওয়া ও পরহেজগারীর নীতিমালা দিয়ে ইসলাম নামক বিধানকে ওহি করলেন, সেই মানুষের পার্থক্য সৃষ্টিতে ওহির আমল না হয়ে অর্থের আচরণ কিভাবে মূল্যায়িত হলো এর যুক্তি আজও বিজ্ঞানভিত্তিক হতে পারে নাই। একজন গোত্রপতি তার প্রতিপত্তির কারণে এক ধরনের মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখবে এবং তাদেরকে চরম অমানবিকভাবে গরু-ছাগলের মত হাটে বাজারে বিক্রি করবে এটা কোন যুগেই কোন নবী নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারেন নি। অথচ লক্ষ লক্ষ নবীদের ইতিহাস আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও আজও মানুষ নবীদের কাজের নীতিকে অবমূল্যায়িত করে তাদের মেকি কৌলিন্যের কারণে কিছু মানুষকে সামাজিকভাবে বয়কট করে চলছে। অথচ তারাও একই আদমের এবং লক্ষাধিক নবীর স্বীকৃতির ইতিহাস স্বীকার করে।

আজকে যারা একদল মানুষকে আমাদের দেশে জোলা (তাঁতী) বলে তাদেরকে সামাজিকভাবে শ্রেণীবিন্যাসে হীন চোখে দেখে, তাদের জানা উচিত ছিল যে, তাদের আদি পিতা আদম (আঃ) পরিচ্ছদের প্রয়োজন অনুভব করলে

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তাকে জিবরাইল (আঃ) -এর মাধ্যমে পরিচ্ছদ তৈরীর পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং আদম (আঃ) নিজে সেই পরিচ্ছদ তৈরী করেছেন। যে আদম (আঃ) নিজে কাপড় তৈরী করলেন, সেই আদমের উত্তরসুরিদের একটি দলকে জোলা জ্ঞানে অবজ্ঞা করা মানে নিজের ভাইর সাথেই প্রতারণা করা। এহেন প্রতারণার মাধ্যমে সে শুধু তার অজ্ঞাতে ক্রীতদাস প্রথার মত একটি প্রথাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে না, অধিকন্তু যিনি আশরাফুল মখলুকাত উপাধিতে মানুষকে ধন্য করলেন তাঁকেই কটাক্ষ করা হচ্ছে।

জোলা বলে যাদেরকে ম্লেচ্ছ ভাবা হচ্ছে তারা আজ শিক্ষা দীক্ষায়, আমলে আখলাকে অজোলাদের চেয়ে বহুগুণে উন্নত, মার্জিত, ভদ্র, নম্র হওয়া সত্ত্বেও তারা এখনও বৈবাহিক সম্পর্কে অজোলাদের সমাজে স্থান করে নিতে পারছে না। অথচ অজোলারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসারী দাবি করছে। মোহাম্মদ (সাঃ) নিজে যেখানে সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের লোক হয়েও আরবের অসম্ভ্রান্ত গোত্রের লোকের রাখালের কাজ করতে দ্বিধা সংকোচ করলেন না, হজরত খাদিজা (রাঃ) ব্যবসার কর্মচারীর কাজে কোরেশের কৌলিন্যকে গ্রাহ্য করলেন না এবং ক্রীতদাসীদের বিবাহ করে যখন অজাতে নেমে গেলেন না, তখন তাঁর অনুসারীদের কথিত কৌলিন্যের এত ভেনিটি কোন কর্মের মূল্যায়নে বিবেচিত হবে?

নিজ হাতে সুতা ও কাপড় তৈরী করার কারণেই যদি একটি মানবগোষ্ঠীকে জোলা জ্ঞানে ম্লেচ্ছ ভাবা হয়, তবে তারা কোন জোলা, যারা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুতা ও কাপড় তৈরী করে জাতে উঠতে চান? তাহলে হাজারো বস্ত্রকলের মালিকগুলো এবং তাদের কর্মচারীরা অবশ্যই জোলা ছাড়া কিছুই নয়। জোলারা তাদের কর্মের কারণে সমাজের কুলীন হবার অধিকারী। কারণ মানব সভ্যতার মূল মূল্যায়নে পরিচ্ছদের প্রয়োজন সর্বাগ্রে বিবেচিত হয়েছিল বলেই ইবলিসের প্রতারণায় গন্ধম ফলের ভক্ষণে আদম-হাওয়াকে পরিচ্ছদের প্রয়োজনে জান্নাতের পত্রপল্লবে আবৃত হতে হয়েছিল। সভ্যতার প্রয়োজনে পরিচ্ছদের অভাব মিটানোর জন্য যারা নিজ হাতে সুতা ও কাপড় তৈরি করে উলঙ্গ ও অসভ্য অবস্থাকে ঢেকে রাখার জন্য কাপড় তৈরির কর্ম হাতে নিলেন, তাদেরকে অজোলারা অজাত ভেবে পক্ষান্তরে অমানুষিকতারই পরিচয় দিচ্ছেন।

আজকের বিশ্বে যে হারে ও মানে পরিচ্ছদের ব্যবহার ঘটছে, তাতে তো জোলাদেরকে সংবর্ধনা দেয়ার কথা। যে মসলিন কাপড় তৈরির ইতিহাস আজও বাংলার ঘরে ঘরে আলোচিত এবং যারা সেই মসলিন পরিধান করে কৌলিন্যের

www.amarboi.org

রাজা-রানী সাজলেন, ইতিহাসের পাতায় তারা ধীকৃতই হয়ে আছে। আর যারা ঐ মসলিন তৈরি করলেন তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় না থাকলেও তাদের কর্মের কৌশল আজও মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে। তাই বলছি, কৌলিন্য? সেতো মানুষের কর্মে-গর্বে বা অহংকারে নয়। অথচ অহেতুক গর্বাহংকারে কৌলিন্যের কোন একটি কারণ না থাকা সত্ত্বেও একধরনের মানুষ সমাজের কিছু মানুষদেরকে কৃষি কাজ করে বলে চাষা; মাটির পাত্রাদি তৈরি করে বলে কুমার; হাতের কলে তৈল তৈরি করে বলে কলু; লোহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে বলে কামার; মাছ ধরে এবং উহা বিক্রি করে বলে জেলে ইত্যাদি বহুভাবে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস করে তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় করে দেখা হচ্ছে। এটা কি কোন অবস্থায় রসুল (সাঃ) এর তরিকা এবং খেলাফতী দায়িত্বের আশরাফুল মখলুকাতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে?

সভ্যতার তথা মানবতার মূল্যায়নে যে খাদ্যবস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদনকারী তার্দেরকে চাষা, কামার, কুমার, কলু ইত্যাদি জ্ঞানে কি করে মানবতার মূল্যায়ন হতে পারে? মানুষের শ্রেণী বিন্যাসের বিবেচনা নিয়ে যে মানুষ ইসলামের নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবাদতে আল্লাহ হতে ইহকাল ও পরকালের মুক্তি চায় তারা কোন অবস্থায়ই ঐ মুক্তি পাবে না। কারণ সেতো খেলাফতী দায়িত্বের সামগ্রিক মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহর প্রতিনিধি বিবেচনা করতে পারছে না। কর্মের কৌলিন্য যখন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সংজ্ঞা তখন কর্মকারকদের ঘৃণা করে সেকি তার আত্মা ও আল্লাহর সাথে প্রবঞ্চনা করছে না?

যারা আজ মেকি কৌলিন্যের কারণে রাজা, বাদশাহ, লর্ড, তালুকদার, জমিদার, খান, চৌধুরী ইত্যাদি খান্দানের খরিদ্দার হয়েছেন, তারা কারা? কি তাদের কৌলিন্যের কারণ? কোন তাকওয়া পরহেজগারীর মূল্যায়নে তারা মরতাবা বা কৌলিন্যের অধিকারী? প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় তাদের কর্মের অবদানই বা কি? তাদের অর্জিত খাদ্যবস্ত্র কি তাদের কোন শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়াসে হয়েছে ইত্যাদি সকল প্রশ্নের জবাব এটাই যে, তারা প্রত্যেকেই পূর্বালোচিত চাষা, কামার, কুমার, জেলে এবং শ্রমিক-মজুরদের শোষণের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। আর তারাই সৃষ্টি করেছে আদি আদমের ক্রীতদাস, শ্রমিক, মজুর, কামার, কুমার, কলু ও কুলি।

ইদানীং আমাদের দেশে এবং এমনকি প্রাচ্যের বহু দেশেও বড় চাকরি কৌলিন্যের একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ঐ চাকরিটি কর্তব্য আমানতের

www.amarboi.org

দায়িত্বে বিবেচিত না হয়ে নেহাত বড় চাকরি বলেই সমাজে সম্মানের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ঐ বড় চাকরিওয়ালার তার কর্মে ও কর্তব্যে আমানতকারী এবং ব্যক্তি চরিত্রে তাকওয়া পরহেজগারী নেই। সে বড় চাকরির সুবাদে একজন বড় ঘুষখোর এবং তার অধীনস্ত কর্মচারীদেরকে নিচুজ্ঞানে তাদের সাথে যে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে তাতে মনিব ও গোলামের সম্পর্কই প্রকটিত হয়েছে। সেখানে মানুষের মর্যাদা প্রকাশিত হয় নি। আমার জীবনে বহু মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট এবং সরকারী বড় চাকরিওয়ালাদের দেখেছি, যারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে চরমভাবে চরিত্রহীন। সামাজিকভাবে যদি কোন মানুষকে শ্রেণীবিন্যাস করে ম্লেচ্ছ বা নিম্নমানের লোক বিবেচনা করতে হয়, তবে তারাই পরহেজগার লোকদের দ্বারা বয়কট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পৃথিবীর কথিত সভ্যতার সমাজে উহার বিপরীতই আমরা দেখতে পাচ্ছি। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এদেশের তথাকথিত পীর মাসায়েখরাও এ চরিত্রহীন প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী এবং সরকারী বড় অফিসারদের অধিক সম্মান দিয়ে তাদের তোয়াজ করে আসছেন।

বাংলাদেশের বাইরে সেই ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকা দেশসমূহের বহু মানুষ জন্মের সাদা ও কালো হবার কারণে সাদারা কালোরে ক্রীতদাসদের মতো নির্যাতিত করে চলছে। এশিয়াবাসীদের মত ইউরোপে ও আমেরিকাতে সৈয়দ, খান, চৌধুরীদের ন্যায় চৌকস চলন বলন নেই সত্য কিন্তু আফ্রিকা, আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলোতে সাদা কালোদের পার্থক্যবোধ চরমভাবে বিবেচিত হচ্ছে। ইউরোপের কোন কোন দেশে কালোদেরকে সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে ক্রীতদাস জ্ঞানে সাদাদের খেতে-খামারে, কলে-কারখানায় নিম্নমানের কর্মেব্যবহার করা হচ্ছে। যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস না করে অমুসলমান হিসেবে মানুষের মর্যাদাকে শ্রেণীবিন্যাস করে দেখছেন তাদের কথা বাদ দিলাম; কিন্তু যারা ইসলামে এসে মুসলমান হয়েছেন, তারা কি করে এবং কোন বংশের কৌলিন্যের কারণ দেখিয়ে অন্যদেরকে কামার, কুমার, কুলি, কলু, জোলা ইত্যাদি বিবেচনা করে সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের থেকে দূরে থাকতে চায়?

একটি অফিসের নিম্নবেতনভুক্ত একজন সৎ, নামাজি ব্যক্তির মোকাবিলায় কি করে একজন ঘুষখোর দায়িত্বহীন বড় অফিসার কৌলিন্যের কারণ দেখিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় উহা আমার জ্ঞানে ধরে না। খেলাফতী দায়িত্ব নিয়ে যার পৃথিবীতে আগমন এবং খেলাফতের যোগ্যতার জন্য আল্লাহর যে ছিফতের শিক্ষা

www.amarboi.org

উহাকে মুসলমানরা বেমালুম ভুলে গিয়ে মেকি কৌলিন্যের কারণ হিসেবে নিজস্ব খান্দান বা বংশের প্রাধান্যে মানুষের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে রাখছে। অথচ কাতারবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়ার শিক্ষাই ছিল ধনী-গরীব, সাদা-কালো, সৈয়দ-পাঠানদের প্রভেদকে পরাভূত করা। হুজুর (সাঃ) বলেছেন, 'যে দাসরা সালাত (নামাজ) কায়েম করে তারাই তোমাদের ভাই।' ঐ নীতিমালার নিয়ম থেকে এ কথা কি স্পষ্ট হয়ে যায় না যে, কথিত সৈয়দ, খান, চৌধুরীরা একই মসজিদের কামার, কুমার, জোলাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ পড়ার কারণে জোলারা সৈয়দদের ভাই হয়ে গেছে।' আর তাই যদি হয়, তবে জোলা, কামার, কুমার, কলু ও কুলিরা এমনকি কালোরা সাদা, সৈয়দ চৌধুরীদের চিন্তায় বৈষম্যের বিবেচনা করছে কেন?

মানবিক মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের যে পাঁচটি রুকন রুজু করলেন সেগুলোকে মুসলমানরা মূল এবাদত সর্বস্বজ্ঞানে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করেন সত্য, কিন্তু উহার হাকিকতে যে সাম্যের শিক্ষা উহা আজও মুসলমানদের মধ্যে মূল্যায়িত হয়নি। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইসলামের মৌলিক কয়েকটি সূত্র। আসলে ঐগুলোর হাকিকতের শিক্ষাই মূলতঃ ইসলামেরই শিক্ষা। যে নামাজ গরীব প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে দেয়, যে রোজার উপবাস প্রবৃত্তির প্রয়োজনকে সংযত করে না, যে হজ্জ বিশ্বভ্রাতৃত্বের অবমূল্যায়নে অবহেলিত হয়ে তাউফ সর্বস্ব এবং যে যাকাত, যাকাত দেওয়ার ব্যবস্থাকে উৎখাত করে না উহা কি করে ইসলাম হতে পারে? প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে প্রবৃত্তির প্রয়োজনকে সংযত না করা; বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অবমূল্যায়নের 'তাউফ' এবং সর্বোপরি যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকা কোন অবস্থায়ই ইসলাম হতে পারে না। ইসলাম তো তাকেই বলে, যিনি গরীব প্রতিবেশীকে পেট ভরে খাইয়ে নামাজ পড়ে; অভুক্তকে খাদ্য দিয়ে ইফতার করে; বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল্যায়নে ধনী-গরীব, সাদা-কালোর বিভেদকে ভুলে গিয়ে যিনি তাউফে একাকার হয়েছেন এবং যিনি গরীবকে যাকাত দিয়ে তার গরীবত্বকে ঘুচিয়েছেন।

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা পাঠকরা হয়তো বা নিশ্চিতভাবে বুঝেছেন যে, ইসলামে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত মূলতঃ সাম্যের ও মৈত্রীরই কারণে। যে নামাজের সারিবদ্ধ কাতারে সৈয়দ ও জোলা, কামার ও কুমার, রাজা ও প্রজা, বাদী বা ফরিয়াদি ও আসামী ইত্যাদি একাকার হয়ে একই ধ্যানে একই দিকে এবং একই আল্লাহর এবাদতে দাঁড়ায়; তারা কি করে এবং কোন মানসিকতায়

www.amarboi.org

নামাজ শেষে জাতের বা কৌলিন্যের কারণে মসজিদের বাইরে বিভেদের বিবেচনা করে?

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তিনি কোন জাত সৃষ্টি করেন নাই এবং উহাই সমস্ত নবী রসূলদের শিক্ষা। তা না হলে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মত একজন নবী এবং তৎকালীন সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের লোকের পক্ষে সমাজের অবহেলিত ক্রীতদাসীদের স্বামীত্ব গ্রহণ সম্ভব হতো না। তাকওয়া পরহেজগারীর বিবেচনার বিকল্পে জাতের ও বংশের বিবেচনা এত বেশি বিবেচিত হচ্ছে যে আল্লাহর বাণী- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

অর্থঃ মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে লও (হুজুরত-১০) এ নির্দেশ ভুলে গিয়ে আমরা যেমন আমাদের খেলাফতী দায়িত্বের কথা ভুলে গেছি। তেমনি আমরা ভুলে গেছি আমাদের মর্যাদার আদেশের আয়াত। মুমিনদের মর্যাদার প্রশ্নে আল্লাহ্ বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ط

অর্থঃ দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ইমান রক্ষা করে চল। (আল-ইমরান-১১০)

কথিত কৌলিন্যের কদর্যতা প্রতিদিন আমার আপনার ঘরের কর্মকান্ডেও প্রকাশিত হচ্ছে। কৌলিন্যকে বজায় রাখতে গিয়ে আমাদের অলস কুলিনরা তাদের গৃহকর্মে একজন অতিরিক্ত অসম্মানীয় লোককে পুষতে হয়। তাকে ভাষার ব্যবহারে কেউ 'বাসার চাকর' অথবা 'বাসার কাজের লোক' অথবা ইংরেজিতে বললে servant বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমাদের বহু কুলিনদের ঘরে এদের মর্যাদা প্রায় সেই প্রাচীন দাস প্রথার মতই। এদের সাথে কুলিনদেরই আচার আচরণে আবার যেন নতুন ক্রীতদাস প্রথারই প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। তাদের কিছু খেতে দিতে হলে তাদেরকে দিতে হবে বাসি খাবার, অখাদ্য, কুখাদ্য পরিমাণে কম এবং নির্দিষ্ট নিম্নমানের পাত্রে, যাতে অন্ততঃ কুলিনরা নিজে এবং

www.amarboi.org

অপরকে বুঝাতে পারে যে ঐ ব্যক্তিটি তাদের বাসার চাকর। কারো বাসায় কোন একটি ছোট চাকর বা চাকরানী আছে যে হয়তো বা এখনও কৌলিন্যিবোধের কারণ বুঝে উঠতে পারে নাই। তাই সে বাসার অন্য ছোটদের সাথে পার্থক্যের কারণ বুঝে উঠতে না পেরে হয়তো বা মনিবের ছোট ছেলের খাবারের কোন অংশ খেয়ে ফেলছে অথবা খাবারের দিকে হা করে চেয়ে আছে, অথবা ঐ খাবারকে কেন্দ্র করে মনিবের ছোট সন্তানটির সাথে সু-আচরণ করে নাই। এহেন অবস্থায় ঐ চাকরটি মালিকের অথবা মালিক গৃহিনী কর্তৃক পরম অমানবিকভাবে প্রহরিত হতে থাকলো। ঐ অবুঝ মনে কৌলিন্যের কারণ উপলব্ধির অক্ষমতা তার জীবনে যে বঞ্চনার বেশুমার ইতিকথা ভেসে উঠে, উহা ব্যক্ত করার ভাষা সে খুঁজে নিতে শিখে তার উচ্ছ্বসিত আঁখিজলে। আর ধৈর্যের সাথে সে বুঝতে থাকে কৌলিন্যের কারণ। যদি তার বুদ্ধি বিবেচনা চাকর ও মালিকের পার্থক্য বুঝে উঠতে ব্যর্থ হয়, তখন তার ভাগ্যে বিতরণের বিড়ম্বনাময় বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণায় তাকে বিদায় নিতে হয়। আমরা আমাদের বাসার কাজের লোকটির সাথে ভাল ব্যবহার করি না। তাকে খেতে দিলে কম ও নিম্নমানের খাবার, পরতে দিলে অপরিচ্ছন্ন অল্প দামের কাপড়, করতে দিলে কঠিন ও ক্লান্তিদায়ক কাজ, আর বলতে গেলে অশ্লীল ও অশালীন ভাষায় গালি এবং এটাই যেন গোলাম ও মনিবের মানদন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাসার ঝি চাকর -বাকর এরা নেহাত অভাব ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে আমাদের ঘরে আসে। তারাও মানুষ এবং মানুষ মাত্রই ভুলের যে স্বাভাবিক শিকার হবে এটাকে ঘৃণাভরে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু বিষয়টি বিবেচনায় বিবেকের বিচার মানুষ হিসেবে অবশ্যই আমাদের করতে হবে। বাসার ঝি চাকর-বাকরেরা বহুক্ষেত্রে বহু ধরনের অন্যায় করে গৃহকর্তার সম্মান ও সম্পদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে সত্য, কিন্তু এর বিবেচনায় ঝি-চাকরের উপমায় না হয়ে মানবিক মূল্যবোধে বিবেচিত হলে দেখা যাবে যে ঝি-চাকরদের অন্যায়গুলোর মত অপরাধ গৃহকর্তার আপনজনরাও প্রতিদিন করে বসছে। কিন্তু এ আপনজনদের বেলায় তো কোন গঞ্জনার গালি আসছে না? তারা তো কোনদিন বিতাড়িত হয়নি?

ঝি-চাকররা আপনার আমার মত গৃহকর্তার ও গৃহিনীর প্রতিদিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কত সেবা যত্নই না করে চলছে। ঐ ঝি-চাকররা গৃহকর্তার সংসারে হাট-বাজার করছে, তারা আমাদের খাবার তৈরী করে খাবার টেবিলে সাজিয়ে দিচ্ছে, কাপড় চোপড় সাবান দিয়ে ধুইয়ে পরিষ্কার করে ইস্ত্রি করে গোছগাছ করে দিচ্ছে; তারা ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে

www.amarboi.org

রাখছে; গৃহিনী অথবা গৃহকর্তার কোন একজন অসুস্থ বা অচল হয়ে পড়লে তার সার্বিক সেবা এমনকি তার পায়খানা প্রস্রাব পর্যন্ত পরিষ্কার করে নিচ্ছে; তারা আপনার আমার ঘুমাবার বিছানাটি ঝাড়ঝোড় দিয়ে গুছালো অবস্থায় সাজিয়ে দিচ্ছে; আপনার উচ্ছিষ্ট খাবারগুলোও সে খেয়ে নিচ্ছে। ঝি-চাকরদের প্রতিদিনের এত যে সেবাযত্ন তার বিনিময়ে মানবিক মূল্যায়নে তারা কতটুকু আমাদের আপন হতে পারছে?

মনিব গৃহকর্তারা হয়তো বা ভাবছেন যে, ওদের সেবা যত্ন তো অর্থের ও খাদ্যের বিনিময়ে। কিন্তু ঐ অর্থ এবং খাদ্য তো আমরা আমাদের একান্ত আপন সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোনদেরকেও দিয়ে থাকি। অথচ অর্থ ও খাদ্যের বিনিময়ে আমরা কি আমাদের আপনজনদের কাছ থেকে ঝি চাকরদের সেবার শতভাগের একভাগও পেয়ে থাকি? এ প্রশ্নের উত্তর নাসূচক হবে। তাই যদি সত্য হয়, তবে কোন মূল্যবোধ ঝি চাকরদের মত আপন আত্মীয়কে চিনতে গৃহকর্তার মানসিকতায় মানবিক মূল্যায়ন হয় না? বরং সামান্য অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণে ঝি চাকররা নির্যাতিত এবং মেকি কৌলিন্যের কারণকে সামনে রেখে গৃহকর্তারা ঝি চাকরদেরকে অশালীন ভাষায় গালি গালাজ, পত্রপাঠ বিদায়, এমন কি নিজের হাতে মুনিব কর্তৃক ঝি-চাকরদের নির্মম হত্যার বিচারও আমাকে করতে হয়েছে। প্রসঙ্গটা তত প্রয়োজন নয় এবং নারী সমাজকে খাটো করে দেখার উদ্দেশ্যেও নয়, তবু প্রাসংগিক কারণে বলতে হয় যে, ঝি-চাকরদের নির্যাতন নারীদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে বেশী।

গৃহকর্তা ও গৃহিনীদের উল্লেখিত মানসিকতায় মানবতার অবমূল্যায়ন মর্যাদাগত হয়ে দাঁড়াতে পারে, এ বিবেচনায় হুজুর (সাঃ) ১৫ শত বছর আগেই মুসলমানদের সাবধান করে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের চাকর-বাকরদেরকে ক্ষমার চোখে দেখবে। এ ব্যাপারে হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি নবী করিম (সাঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চাকর-বাকরদেরকে আমি কতবার ক্ষমা করবো? তিনি চুপ রইলেন। সে পুনরায় তা জিজ্ঞেস করলেন। এবারও নবী (সাঃ) চুপ রইলেন। অতপর যখন তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, চাকর-বাকরদেরকে দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করবে।' (আবু দাউদ, তিরমিজি)

হুজুর (সাঃ) এর এ হাদিসের ইসারা আকলমানদের জন্য ঐ শিক্ষাই দিয়ে যাচ্ছে যে, প্রকৃত আপনজন ঐ ঝি-চাকরদেরকে ক্ষমার মাধ্যমে মানুষ তার মেকি মনিবত্বকে অবশ্যই ঘুচাতে শিখবে। আর এও আমাদের বুঝতে হবে যে

www.amarboi.org

পরিবারের আর পাঁচটি আপনজনদের মত ঝি-চাকররাও আমাদের একান্ত আপন এবং আমাদের আত্মার সহযোগী। তাদের সহযোগিতা ছাড়া যখন আমরা চলতে পারছি না, তখন তাদেরকে আপন করে নিয়ে আমিত্বের অহমিকাকে উপড়ে ফেলে আল্লাহতে পৌছে যাওয়াই মানবতার সঠিক মূল্যায়ন হতে পারে।

অহংকার আমিত্বের রূপ। আর আমিত্ব কৌলিন্যের অহংকারের জন্মদাতা এবং ঐ কৌলিন্যের কালো চিন্তায় মানবতার মানদন্ড হারিয়ে ফেলে। তাই সেখানেই পার্থক্যের বিবেচনায় বড়র চিন্তায় নীচুদেরকে খাটো করে দেখাতে শেখায়। যাকে মুচি, মেথর, ধোপা, নাপিত জ্ঞানে সমাজে অবহেলিত করে রেখেছি এবং ম্লেচ্ছ ভেবে ব্যতিক্রম ধর্মী বিভেদ টেনে রেখেছি, সে কি আদম হাওয়া থেকে আসে নি?

একজন বিচারক হিসেবে আমার বিবেচনায় এহেন অযৌক্তিক অবহেলা নেহাত অবাঞ্ছিত এবং কথিত কুলিনদের শক্তি ও হেকমতের কারণেই সম্ভব হয়েছে। অথচ এ মুচি, নাপিত, ধোপা, মেথররা না থাকলে আমাদের কুলিনদের অবস্থা শুধু করুণই হতো না বরং মানবসভ্যতা মহাসংকটে উপনীত হতো এবং মানুষ যে আশ্‌রাফুল মাখলুকাত এ ধারণা পশুদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে মহান আল্লাহকে উহারাও উপলব্ধি করতে পারতো না।

যাদের মুচি বলা হচ্ছে, উহাদের মুখ্য মূল্যায়ন মানুষের জুতায়। জুতা পরা শুধু সভ্যতা, ভদ্রতা ও সৌখিন্যই নয়, বরং জুতার ব্যবহার আছে বলে কুলিনরা কন্টকাকীর্ণ পথে চলতে পরম আনন্দই পায়। মুচি তথা জুতার অনুপস্থিতি সকল মানুষের অকল্যাণই ডেকে আনবে না কি?

যে নাপিতকে অবহেলা করে অন্যকে 'নাপিত' বলে গালি দেয়া হচ্ছে, সেই নাপিতই মানুষের চুলে ও বালে ক্ষৌরকর্মের দ্বারা তার জংলীরূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে পশু থেকে পার্থক্য করে দেয়নি কি? যে ধোপাকে তার কাজের জন্য ধিক্কৃত করা হচ্ছে, সেই ধোপার ধোয়া সকল কাপড়ই তো কুলিনদের কল্যাণের কারণ। যে মেথর বা সুইপারকে তার কাজের জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে, তার কর্মের অবদান আমরা মুর্খ কুলিনরা একবারও মূল্যায়ন করতে চাই না। অথচ কোন একটি সভ্য বা অসভ্য শহরে মেথরদের একদিনের অনুপস্থিতি কথিত সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দিতে পারে এবং তখন ঐ সভ্যদের সহ অবস্থান অবশ্যই শৃগাল, কুকুর ও শকুনদের সাথে হতে হবে। কারণ সুইপারদের অনুপস্থিতিতে

www.amarboi.org

তাদের কাজ করার জন্য আল্লাহ এ শৃগাল, কুকুর এবং কাক শকুনদেরই তৈরী করেছেন।

কথিত কুলিনদের ইদানীং মানসিকতার পরিবর্তন কিছুটা ঘটেছে। তারা এখন নাপিত, ধোপা, মেথর, মুচি হতে রাজি। তবে দেশে নয়-বিদেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে। এদিকে এ মুচি, ধোপা, নাপিত এবং মেথরদের হেয় প্রতিপন্ন করে কুলিনদের গালমন্দের কারণে তারাও তাদের ঐ ঘৃণ্য কাজ আজকাল ছেড়ে দিয়েছে। তাই কুলিনরা বাধ্য হয়ে ঐ কাজ এখন নিজেরাই শিখে নিয়েছে। তাই সকালবেলা দেখছি ঐ কুলিনরা নিজেরাই ব্লেড কিনে নিজের দাড়ি মোচ নিজেরাই কাটছে। বাথরুমে হারপিক ও ব্রাশের ব্যবহার আজকাল কুলিনরা নিজেরাই করে থাকেন। এহেন মানসিকতার পরিবর্তন কোন মানবিক মূল্যবোধের কারণে নয়, বরং কথিত Dignity of Labour-এর নামে। আর এখানে তারা মানুষের মর্যাদার কথা ভাবছেন না- তারা ভাবছেন কর্মের মর্যাদার কথা। অথচ আল্লাহ মানুষকে মর্যাদাশীল করতে চান তাদের কর্মের মাধ্যমে। কিন্তু কুলিনরা কর্মকারকদের মর্যাদা না দিয়ে বরং কর্মের মর্যাদা দিচ্ছেন। এহেন বৈপরীত্য কি খেলাফতী দায়িত্বের পরিপূরক? সাহাবীরা একদা জিজ্ঞেস করলেন, কে আল্লাহর সর্বাধিক অনুগ্রহভাজন? হুজুর (সাঃ) বললেন, 'যার নিকট আল্লাহর সৃষ্টিজীবগণ সর্বাধিক উপকার পায়।' মেথর, মুচি, কামার, কুমার, ধোপা, শ্রমিক, মজুর থেকেই কি কোটি কোটি মানুষ সর্বাধিক উপকার পায় না?

ঐ সকল নাপিত, ধোপা মুচি মেথরদেরকে তখনই অবজ্ঞা করা যেতে পারে যখন তারা আল্লাহ ও তার আদেশের বিপরীত কর্মকান্ডে ব্যবহৃত থেকে নিজেই নিজের মর্যাদাকে হেয় করে ফেলেছে। তবুও তাদেরকে ঘৃণাভরে অবহেলা করা যাবে না। কারণ তাকে ঐ অবস্থায় থাকতে দেয়া মানে মানব সভ্যতার অঙ্গহানি ঘটানো। তাই সভ্যতা ও সৃষ্টিচারের প্রয়োজনে প্রতিটি অবহেলিত এবং অসদাচরণযুক্ত মানুষের কাছে তার মর্যাদার কথা পৌঁছে দিতে হবে। যাতে আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির কাছে মানুষ অমর্যাদাশীল প্রমাণিত না হয়ে যায়।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হবার পরে আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে কোন অমর্যাদাজনক আচরণ আশা করেন না। যে কুলিনরা অথবা মনিবরা জাতের প্রশ্নে কুলি, মজুর অথবা মেথর মুচিদেরকে ঘৃণা করছেন, তারাই বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঐ ম্লেচ্ছদের মেয়েদের সাথে ব্যভিচার ব্যাপৃত এবং প্রয়োজন হলে বিবাহ করে বসেন। তখন তাদের জাত যায় না। কিন্তু নিজের মেয়েকে কখনও ঐ কথিত ম্লেচ্ছদের সাথে বিবাহ দিতে রাজি না। কারণ তাতে কুলিনদের জাত যাবে।

www.amarboi.org

সামগ্রিক ভোগের অধিকারই যেন কুলিন ও মনিব হবার যোগ্যতা। আসলে কুলিনদের জাতের জিদ কোন তাকওয়ার ভিত্তিতে নয়, বরং মেকি ম্লেচ্ছ জ্ঞানে যাতে প্রতিনিধিত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের প্রয়াস নেই। যে ইসলাম সাম্যের সন্ধানে তাকওয়া পরহেজগারির পয়গাম দিল, সেখানে মুসলমানরাই আজ অসাম্যের অবাস্তব আচরণে জাতের এত বেড়া বাড়াচ্ছে, যাতে মানব মুল্যায়ন নেই বললেই চলে।

বিশ্বময় আর একটি বিভেদের ব্যাধি মানবগোষ্ঠীকে সংক্রমিত করে চলেছে। আর উহা হলো কলে- কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের সংঘাত ও সংঘর্ষ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 'মে দিবসের মত একটি আন্দোলন, যা' মেহনতি মানুষের মর্যাদার কথা বলে মজুরদেরকে মালিকের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। মজুরদের অল্প বেতনে মালিকদের অধিক মুনাফা মূলত সংঘাতেরই কারণ। মালিকদের এহেন মানসিকতা শ্রমিক আন্দোলনের নামে মেহনতি মানুষকে পক্ষান্তরে পরোক্ষভাবে তাদেরকে বামপন্থী শিবিরে নাস্তিক করে তুলছে। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে দাবির অধিকারে আবার সৃষ্টি হচ্ছে Labour Leader এবং ঐ শ্রমিক নেতারা শ্রমিকের গায়ের ঘামকে মূলধন করে মালিকদের সাথে আপস করে তারাও দুপয়সা আয় করে নিচ্ছে। অথচ শ্রমিকের অধিকার আদায় করাতো মালিকেরই দায়িত্ব ছিল। কিন্তু মালিকের মানব মূল্যায়নের মানদন্ডে সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর ধারণা না থাকার কারণে সে মালিক ও শ্রমিকের বৈষম্য বুঝে উঠতে পারে না। যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তার কথা বাদই দিলাম। কিন্তু যে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে তার তো খুঁজে নিতে হবে মানব মূল্যায়নের মূল্যবান বাণী। শ্রমিক ও মালিকদের বিরোধকে বিদূরীত করার প্রয়াসে আমরা যদি মহানবী (সাঃ) এর আদিষ্ট বাণীগুলোর মূল্যায়ন করি, তবে মূল্যবোধে মালিক শ্রমিকের পার্থক্য অবশ্যই আদায় করে আনবে শ্রমিকের সম্মান। আর মালিক ফিরে পাবে প্রতিসম্মানের পরকালীন সম্মানের সাধ। হুজুর (সাঃ) বলেন–

امطوا الا جيرا جره قبل ان يجف ويقه

অর্থঃ মজুরকে তার ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী পরিশোধ করে দাও। আর একটি হাদিসে হুজুর (সাঃ) বলেন-

ان رسول الله عن الا سحادة الا جير حويمن له احده -

অর্থঃ মজুরের বেতন নির্দিষ্ট না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করতে নবী (সাঃ)

www.amarboi.org

পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করেছেন। অন্য একটি হাদিসে হুজুর (সাঃ) বলেন-

امطو العامل من مملہ فان مامل -

অর্থঃ মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না।

ঐ হাদিস দ্বারা একথা বুঝানো হচ্ছে যে, মজুরের নির্ধারিত বেতন আদায়ের পরও মূল কারখানায় যা মুনাফা হবে তা হতেও মজুরকে অংশ দিতে হবে। উল্লেখিত হাদিসের আলোকে মালিক ও শ্রমিক যদি তাদের পারস্পরিক অধিকার মেনে নেয় তবেই মানব মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নতুবা শ্রেণীবিন্যাসের সংঘাতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যেকার পার্থক্যকে কেন্দ্র করে যে বিপর্যয় নেমে আসবে তাতে সম্পদের উৎপাদনে যেমন ঘাটতি আসবে তেমনি সংঘাত ও সংঘর্ষে মানবতার বিপরীত পশুত্বই প্রকটিত হয়ে উঠবে। আজকাল বিশ্বময় সেই পশুত্বের প্রকাশ ঘটছে অসংখ্য মিল কারখানার শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে। মালিকরা তাদের স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের বিভক্ত করছে বিভিন্ন স্বার্থে এবং পরে মূল স্বার্থ সংঘাতে পরস্পরকে লেলিয়ে দিচ্ছে একে অপরের পেছনে এবং সৃষ্টি হচ্ছে সংঘাত, সংঘর্ষ ও সংহার। এরপর মিল কারখানা বন্ধ, উৎপাদনে অনিয়ম, ব্যক্তি তথা জাতীয় অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা এবং আদর্শিক নীতিমালা থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে নাস্তিকতাবাদে দীক্ষা নেয়। ঐসবগুলোর পরিণতি এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায় যেখানে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর খেলাফতী প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব উহা পালনের আর অবকাশ থাকে না।

অবহেলিত অনেকের কথা উল্লেখ করলে মানব মূল্যায়নের ব্যর্থতার কারণে আরও কিছু অবহেলিতদের আলোচনা না করে পারছি না। সেই অবহেলিতরা হলো আমাদের পথে ঘাটে, স্টিমারে, লঞ্চে, রেলস্টেশনে অন্যবস্ত্রের তাগিদে হাত পেতে থাকা শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ- বৃদ্ধা ভিক্ষুকরা। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে আদৌ উৎসাহ দেয় না। কিন্তু সামাজিক কুসংস্কারের শিকার হিসাবে আমরা অহরহ আমাদের চলার পথে এদেরকে দেখতে পাই। এদের মধ্যে আবার সকলেই প্রকৃত ভিক্ষুক না। সেই অপ্রকৃত অবহেলিতরা ভিক্ষাকে তাদের জীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করে অঢেল টাকার মালিক হয়েছে। সামাজিক সংস্কারে সংশোধিত হতে পারছে না বলে তারাও প্রকৃত অভাবীদের আড্ডায় ঘুরাফেরা করছে। যেহেতু সাধারণ মানুষের চলার পথে তত বিচার বিবেচনার অবকাশ নেই, সেইহেতু ঐ

www.amarboi.org

অপ্রকৃত অবহেলিতরাও বেশ কিছু পয়সা কামিয়ে থাকে। কিন্তু সত্য কি মিথ্যার বেসাতি ঐ ভিক্ষুকদের ভিক্ষা ইসলাম আদৌ স্বীকার করে না। হাদিসে এসেছে-

'যে ব্যক্তি সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষা করবে, আল্লাহ তা হ্রাস করবেন।'

অন্য একটি হাদিসে এসেছে-'সত্যিই আল্লাহর কাছে সেই মুসলিমই প্রিয় যে দরিদ্র হয়েও পরিবারের ভার বহন করে কিন্তু অবৈধ কাজে ও ভিক্ষা করা হতে বিরত থাকে।'

কথায়ই বলে ভিক্ষুকের বাড়িতে কোনদিন দালান ওঠে না। আর এহেন কথার সমর্থন যোগায় হুজুর (সাঃ)-এর হাদিস। যেমন বলা হয়েছে-

'যে কেহ নিজের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির দুয়ার খোলে আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দুয়ার উন্মুক্ত করবেন।'

ভিক্ষা এমন একটি বৃত্তি যা মানবমূল্যায়নে সহায়ক হতে পারে না। ইহা মানুষের মর্যাদাকে খর্ব করে এবং সব সময়ের জন্য সে অর্থনৈতিক নৈরাজ্যে নিরাশার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তার ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু থাকে না। মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে কোন কাজের দ্বারা অর্থ উপার্জন উহাই অধিকতর হালাল এবং সম্মানীয়।

এ ব্যাপারে হুজুর (সাঃ) বলেন- 'সত্যই লোকের কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে, তারা দিক বা না দিক, তোমাদের মধ্যে যে কোনজনের পক্ষে দড়ি নিয়ে কাঠের বোঝা বেঁধে পিঠে এনে বিক্রি করা শ্রেয়, যা করলে আল্লাহ তোমার সম্মান রক্ষা করবেন। (আর ভিক্ষা) তারা যদি না দেয় তোমার সুনাম খর্ব হবে ও তুমি নিরাশ হয়ে ফিরবে। যদি দেয় তাহলে অধিকতর মন্দ। কারণ উহাতে তুমি নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়বে।'

মানুষের মর্যাদার প্রশ্নে হুজুর (সাঃ) যে কথাগুলো বলেছেন উহার আরও কয়েকটি হাদিস বিষয়ের বুঝের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন হুজুর (সাঃ) বলেন-'যার একদিন ও একরাত্রের খাদ্য আছে তার জন্য ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ।'

তিনি বলেন- 'উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম। উপরের হাত ভিক্ষা দাতা এবং নিচের হাত ভিক্ষা গ্রহীতা।'

"ভিক্ষা যদি একান্তই কারো কাছে চাইতে হয়ে, তবে উহা কেবলমাত্র নিঃস্ব এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য অনুমোদনীয়। তবে সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে

www.amarboi.org

যে এ ভিক্ষার হাত যেন-অবশ্যই পুণ্যবান ব্যক্তিদের কাছে হয়।" হাদিসে এসেছে-একজন সাহাবী রসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), আমি অতিশয় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লে লোকের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারি?' হুজুর (সাঃ) বললেন, 'না ভিক্ষা চেয়ো না। তবে নেহাত বাধ্য হলে পুন্যবান ব্যক্তিদের কাছে যাঞ্চা করতে পার।'

এতগুলো পবিত্র বাণী থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে কি করে ভিক্ষার প্রচলন এত বেশি প্রবেশ করলো তার সঠিক কারণ আমার বুঝে আসে না। ইসলাম গঠনমূলক কাজে দানকে উৎসাহিত করে এবং এ কারণেই ইসলামে যাকাতের বিধান রয়েছে। কিন্তু ইসলাম ভিক্ষাকে কোন অবস্থায় অনুমোদন করে না। কারণ এহেন বৃত্তি আশরাফুল মখলুকাতের পরিচয় বহন করে না। অধিকন্তু এর দ্বারা খেলাফতী দায়িত্ব পালনে সে তার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া ভিক্ষার প্রশ্নে যে বিষয়টিকে দিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে দাতাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয় উহা হলো কলেমা তৈয়েবা 'লাই-লাহা ইল্লাল-লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। ঐ কলেমা পড়ে একজন মানুষকে শুধু মুসলমানই হতে হয় না; অধিকন্তু তাকে মর্যাদাশীল প্রতিনিধিত্বে পরিণত হতে হয় অথচ একজন মুসলিম ভিক্ষুক নিজকে অমর্যাদাশীল করার জন্য ঐ কলেমা তৈয়েবার slogan দিয়ে দাতার কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেয়। এতে ভিক্ষুক মুসলমানটির হীনমন্যতার পরিচয়ই শুধু বহন করে না, অধিকন্তু সে কলেমা তৈয়েবার অমর্যাদা করে। অথচ দাতা মুসলিম ব্যক্তিটি ওর কোন প্রতিবাদ না করেই সে ভিক্ষা দিয়ে দানের মাতুব্বুরী করে বেড়াচ্ছে। তাই বহুক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অমুসলিম সম্প্রদায় ব্যঙ্গ করে কলেমা তৈয়েবার তবলিগকে Beggar's slogan বলে আখ্যায়িত করেছে। আর এর জন্য ভিক্ষুক এবং ভিক্ষাদাতা উভয়কেই সমভাবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ তারা কলেমা তৈয়েবার প্রকৃত দাবিকে অমর্যাদা করেছে। তবুও বলতে হয় যে, পৃথিবীর কিছু মানুষ পরিবেশের শিকারে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। এহেন অবস্থায় ভিক্ষাদাতাকে মানবিক মূল্যবোধে ঐ বাড়ানো হাতে কিছু দিতে হবে এবং উহাতে অবশ্যই সহানুভূতিশীল মনের বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে। কিন্তু আমরা ভিক্ষা দেয়া ও নেয়ার ব্যাপারে সহানুভূতিশীল মনের প্রকাশ পাচ্ছি না। আমরা বহুক্ষেত্রে ভিক্ষুককে অশালীন ভাষায় তাড়িয়ে দেই। আর যারা ভিক্ষা করেন তারা ভিক্ষা নেয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হতে পেরে ভিক্ষাদাতাকে অভিশাপ এবং অশালীন ভাষায় গাল দিতে দিতে

www.amarboi.org

পথে নেমে যায়। আমরা সমর্থবানরা যদি আমাদের মহল্লার অভাবীদেরকে আত্মার আত্মীয়তা দিয়ে তাদের গরীবত্বকে ঘুচিয়ে দিতে পারি, তবে সেক্ষেত্রে তারা হয়তো বা মহল্লা ছেড়ে অন্য কোথাও ভিক্ষার জন্য যেত না। এহেন অভাবীদেরকে কর্মের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করতে হবে নতুবা ভিক্ষার মত অসম্মানজনক বৃত্তির দ্বারা তারা তাদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে খেলাফতী দায়িত্বে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এবং করছে।

আল্লাহ বলেছেন-

كُنْتُمْ خَيْرَا اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

অর্থঃ এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা যাহাদিগকে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। (সূরা আল ইমরান ১১০)

মুসলমানদের সামনে উল্লেখিত ওহী থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলোতেই পূর্বালোচিত সামগ্রিক অবক্ষয় এত বেশি হচ্ছে যে উহাতে অমুসলমানরা মুসলমান হবার কোন উৎসাহ পাচ্ছে না। মুসলমানদের এহেন দায়িত্বহীনতার জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে। যে দ্রব্য সামগ্রীক বিবেচনায় একটি মানুষ অন্য একটি মানুষকে হীনচোখে দেখে, সেই দ্রব্যসামগ্রীর সঠিক ব্যবহার মানব কল্যাণে না হলে উহার জন্য মানুষকে অবশ্যই জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ সাবধান করে বলেছেন- مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

অর্থঃ দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রী কয়েকদিনের বিষয়। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল ১১৭)

সম্পদ কারো সচ্ছলতার সহায়ক হতে পারে। আর অভাবগ্রস্তদের অবহেলা করারও যুক্তি প্রদর্শন করে না। অথচ মুর্খ মানুষ তার সচ্ছলতাকে অন্যকে অবহেলার মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছে।

www.amarboi.org

ভিক্ষুকের বৃত্তিটি নেহাত দরিদ্রতার কারণে। এটা যতটা স্বেচ্ছায় নয় বরং অধিকতর অনিচ্ছায়ই দরিদ্রতার দুর্বিপাকে পড়তে হয়। কে যে কখন এহেন দরিদ্রতাজনিত দুর্বিপাকে পড়বে উহা নিশ্চিতভাবে কেউই বলতে পারে না। বিধায়, ধনীদের উচিত হবে দরিদ্রদেরকে অবহেলা না করা। হুজুর (সাঃ) তার উম্মতদের দারিদ্রজনিত ওজরকে উপেক্ষা করে বলতে শিখিয়েছেন দারিদ্রের মহত্ত্বতা। হুজুর (সাঃ) তাই নিজেও বলতেন, 'দরিদ্রই আমার গর্ব' এবং তিনি আরও বলেছেন, 'আমি পরিতৃপ্ত হবো গরীব ও অভাগ্রস্ত পরিতৃপ্ত হলে।' মানব মূল্যায়নের জন্য ঐ দরিদ্রতার মধ্যে লুক্কায়িত আছে ধনীদের মুখ্য শিক্ষা ও সুখ। ঐ শিক্ষায় যদি ধনীরা শিক্ষিত হতে পারে তবে মূল্যায়নের মানদন্ডে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই উপেক্ষিত হতে পারে না। হুজুর (সাঃ) বলেন-

'তোমার চেয়ে নিম্নতম অবস্থার লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখ, ইহা তোমার জন্য মঙ্গলকর হবে, যেন আল্লাহর দানগুলোকে অবজ্ঞা না কর।'

মনে রাখতে হবে একজন অভাবী এবং একজন ভিক্ষুক একই মানের নয়। ভিক্ষুক অনায়াসে অন্যের কাছে হাত পাততে পারে। কিন্তু একজন অভাবগ্রস্ত লোক অনায়াসে অন্যের কাছে হাত পাততে পারে না। ভিক্ষুকের প্রয়োজন তার বৃত্তির কারণে। কিন্তু অভাবগ্রস্ত লোকটির প্রয়োজন তার ঈমানের প্রয়োজনে। কারণ পাছে তার অভাবের কারণে সে ঈমানহারা হয়ে কাফের হয়ে যায়। তাছাড়া মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেও অভাবীদের উপেক্ষা নয় বরং তাদেরকে তাদের প্রয়োজনে দান করে তাদের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ দরিদ্রদেরকে দরিদ্রাবস্থায় ফেলে রাখা মানে মানবতার কলংক ডেকে আনা।

আমাদের সমাজে একদল লোক অবৈধ আয়ের অঢেল টাকার একটি অংশ তার আত্মপ্রচারে দান করে এ কারণে যাতে লোকে তাকে দাতা বলে। কিন্তু এহেন দানের মানসিকতা ঐ দাতাকে জাহান্নামের অগ্নি ছাড়া কিছুই দেবে না। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন-

'সেই ব্যক্তির দানই সর্বোত্তম যে স্বল্পবিত্ত ও আপন শ্রমে বিত্ত অর্জন করে ও তাহা হতে সাধ্যমত ব্যয় করে।'

তিনি আরও বলেন-

'সেই দানই শ্রেষ্ঠ দান যা ডান হাত দিয়ে প্রদান করলে বাম হাতে জানতে পারে না।'

www.amarboi.org

হুজুর (সাঃ)-এর উল্লেখিত বাণীগুলো কি মানবমূল্যায়নের প্রয়োজনে বলা হয় নি? তবে কেন, মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে জাতের ও মতের এত বিরোধ বিবেচনা করে? মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যের আরবী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে। তারা প্রায় সকলেই আরবী ভাষায় কথা বলে। তাদের সকলেরই ক্বাবা এবং কেবলা একই দিকে। এবং সকলেই একই আল্লাহ রসূল ও কোরান হাদিসের অনুসারী। অথচ তারা আরবী ও আজমী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আত্মকলহে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে ভেঙ্গে ফেলতে চলছে। তারা ভাগ হয়েছে শিয়া-সুন্নি; হানাফী-সাফী তরিকায়; মালেকী ও হাম্বলী মাজ'হাবে। তারা বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করেছে আলীয়া এবং খারিজীতে, বিভক্ত হয়েছে মোজাদ্দেদিয়া, নকশেবন্দিয়া, কাদেরিয়া ইত্যাদি তরিকায় এবং দেশজ, জামাতী, তবলীগী, পীর মুরশিদী, আটরশি, নয়রশি, দেওবন্দি, সরশিনা, মাইজভান্ডারী, কাদিয়ানী ইত্যাদি বহু দল ও মতে। আর প্রত্যেকেই তাদের প্রাধান্য খুঁজছে তার প্রতিপক্ষদের ঘায়েলের মাধ্যমে। হাতে না পারলেও মুখের মাছলা দিয়ে তার অনুসারীদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয় যে প্রতিপক্ষরা কাফের এবং তারাই সাচ্চা মুসলমান। অথচ আল্লাহ বলেন-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا -

অর্থঃ সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু (দীন) কে শক্ত করে ধারণ কর এবং দলাদলিতে পড়োনা (আল ইমরান ১০৩)

আল্লাহ বিশ্বাসীদের এহেন আত্মকলহ আত্মার কলুষতা প্রকাশিত হবার কারণে অপরকে আপন করতে শিখায় না। বরং বিভেদের স্থান সৃষ্টি করে সেখানে শয়তান আরও কিছু অপকর্মের উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করে। উপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় হুজুর (সাঃ) বলেন, আল্লাহ একক এবং তিনি একতাই পছন্দ করেন।

পাঠকগণ, একবার ভেবে দেখুন যে, এহেন বিভেদ আদৌ মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে কি? এহেন কলহের কারণ কি জ্ঞান না মুর্খতা? অবশ্যই জ্ঞান নয়। তাই যদি হয় তবে আমরা বিভেদকারীরা কোন্ আশায় এবং কারণে পরকালের মুক্তির প্রার্থী হতে চাই? আমরা যারা বিভেদের বিবেচনা করছি তারা তো মূলত দ্বীনকে ছিঁড়ে খন্ড বিখন্ড করছি যা কোন অবস্থাতেই আল্লাহর অভিপ্রেত নয়। যা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়, তা কি করে আল্লাহর এবাদত হতে পারে? ফেতনা ফাসাদ কখনও এবাদত নয়। আসুন, আমরা হিসাব করে দেখি আমরা এবাদত করছি না ফেতনা ফাসাদ করছি। ফেকা তো আল্লাহ প্রাপ্তির

www.amarboi.org

পথকে সুগম করে দিয়েছে। কিন্তু ঐ ফেকাকে না বুঝে উহাকে ফেতনায় রূপান্তরিত করা যে অপরাধ উহাতো কতলযোগ্য। আসুন, ফেতনাকে উৎখাত করে ফেকা প্রতিষ্ঠা করি। শরিয়তের ফেকার আলোচনা সেতো দর্শন, যা যুক্তিপূর্ণ। ঐ দর্শনকে অনুধাবন করার জ্ঞান আহরণ করতে হবে। কারণ প্রকৃত জ্ঞানই মানুষকে ঐক্যের অগ্রযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

যে সম্পদের সমীকরণে পৃথিবীতে ব্যক্তি থেকে জাতীয়ভাবে উঁচু নিচুর বিবেচনার সুযোগ করেছে, কৌলিন্যের কারণ নির্ধারণ করেছে, বিভেদ ও ব্যথার বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা করেছে, সেই সম্পদকে জ্ঞানের পাশে রেখে হজরত আলী (রাঃ) দশটি মূল্যবান বাণী রেখেছেন। পাঠকদের অনুধাবনের জন্য উহাকেও উদ্ধৃত করা হলো। তিনি বলেন-

(১) সকল নবী রসূলগণ জ্ঞান অর্জনের উপর জোর দিয়েছেন। আর সম্পদের উপর জোর দিয়েছেন ফেরাউন ও নমরুদের মত লোক। সে কারণে সম্পদ অপেক্ষা বিদ্যা শ্রেয়।

(২) সম্পদ মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে; কিন্তু জ্ঞান মানুষকে বন্ধুতে পরিণত করে।

(৩) সম্পদ পাহারা দিতে হয়। কিন্তু বিদ্যা বা জ্ঞানকে পাহারা দিতে হয় না। বরং জ্ঞানই সম্পদকে এবং আপনাকে রক্ষা করতে পারে। তাই জ্ঞান উত্তম।

(৪) বিলি বন্টনে জ্ঞান কখনও হ্রাস পায় না বরং যতই বন্টন করা হয় উহা ততই বৃদ্ধি পায়, প্রসারিত হয়। কিন্তু সম্পদ বন্টন করলে কমে যায়।

(৫) জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের কোন কৃপণতা থাকে না। তার মন থাকে উদার। কিন্তু সম্পদ মানুষকে কৃপণ হিসাবে গড়ে তোলে।

(৬) সম্পদ হারাবার ভয় থাকে, চুরি করা যায়। কিন্তু জ্ঞান চুরি করা যায় না। জোর করে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। তাই জ্ঞান সকলের জন্য নিরাপদ।

(৭) জ্ঞানের ধ্বংস নেই। একবার অর্জন করলে আর নষ্ট হয় না। কিন্তু সম্পদ ক্ষণস্থায়ী: লয় হয়, ক্ষয় হয়।

(৮) জ্ঞান সব রকম মাপজোখের বাইরে। এর কোন সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু সম্পদ মাপাজোখা যায়। সহজেই এর আকার ও আয়তন ঠিক করা যায়।

(৯) জ্ঞান মানুষের অন্তর আলোকিত করে। কিন্তু সম্পদ মানুষের অন্তরকে করে কলুষিত।

www.amarboi.org

(১০) জ্ঞানের তুলনায় সম্পদ একেবারেই মূল্যহীন। কারণ বিদ্যা বা জ্ঞান রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে জন্ম দিয়েছে মানবতা। কিন্তু অঢেল সম্পদের অধিকারী হয়েও ফেরাউন নমরুদরা মানবদরদী হতে পারে নি। তারা হয়েছে কৃপণ, অহংকারী ও ধনপিপাসু। তাই সম্পদের তুলনায় জ্ঞান উত্তম।

উদ্ধৃত এ দশটি বাণী একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে না কি যে, সম্পদের সমীকরণে সীমাহীন বৈষম্যের সৃষ্টি করে? জ্ঞানের কারণে যে সম্পদ উহা জ্ঞানদাতার অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিভেদে ব্যবহৃত হবে সেতো জ্ঞান হতে পারে না। জ্ঞান হলো মানুষের আত্মচেতনা ও সৃষ্টির মধ্যে তার একক গৌরবময় পদমর্যাদা এবং স্বয়ং আল্লাহকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। আর এ ক্ষমতা মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত এ কারণে যে আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমেই স্বয়ং আল্লাহকে উপলব্ধি করা সম্ভব। আল্লাহ যখন সংকীর্ণ সত্ত্বার নয়, তখন তাঁরই রূহের বা আদেশের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ সংকীর্ণতার কুসংস্কারে বিভেদের বিবেচনায় ব্যর্থ হবে এটা হতে পারে না।

যেখানে জ্ঞান মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনা সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়েও আজ মানুষের মর্যাদার অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে খ্যাতিমান জীববিজ্ঞানী Aldous Huxley-এর লেখা Blave New World- বইটিতে কাল্পনিক চিত্রের যে প্রতিপাদ্য একেছেন উহার আংশিক আলোচনা এবং বর্তমান সমাজের অবস্থান বিবেচনা করা যেতে পারে। ৫০ বছর আগের ঐ লেখায়- Huxley - সাহেব আগামী ৫০০ বছরের পরে মানবসভ্যতা কোন্ পর্যায়ে উন্নীত হবে তার চিত্র একেছেন। তিনি তার পুস্তকে বলেছেন যে, মানবসভ্যতা যখন চরম উন্নতির শিখরে আরোহণ করবে তখন মানবসমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

একটি হলো শাসক বা এলিট শ্রেণীর সমাজ। আর একটি হলো শাসিত বা সাধারণ শ্রেণীর সমাজ। সাধারণ লোকের সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল ভোগ করলেও তারা জ্ঞান আহরণ ও প্রযুক্তির বিতরণ ও প্রয়োগের অধিকার হতে বঞ্চিত হবে। জ্ঞান ও প্রযুক্তির আহরণ বিতরণ এবং প্রয়োগের অধিকার শুধু সুবিধাভোগী এলিট শ্রেণীর হাতে থাকবে। একমাত্র সুবিধাভোগী এলিট শ্রেণীর লোকেরাই সাহসী নয়া দুনিয়া, তথা Blave New World-এ লেখাপড়া করে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে। সাধারণ শ্রেণীর জন্য লেখাপড়া বা জ্ঞানার্জনের পথ রুদ্ধ থাকবে। তাদের জন্য এ পথ হবে নিষিদ্ধ।

মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালোবাসা বলে সাহসী নয়া দুনিয়ার সমাজে কিছু থাকবে না। কারণ এ সমস্ত হৃদয়ঘটিত ব্যাপার এবং হৃদয়ের তাড়না জাগতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে বিবাহ প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে। যুবতী

www.amarboi.org

রমণীরা Chestity Belt পরে থাকবে যাতে তাদের কোনক্রমেই গর্ভবতী হবার অবকাশ না থাকে। প্রতিভাবান ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিভাময়ী সুন্দরী নারীদের ডিম্বকোষে সন্তান জন্মানো হবে। তারা হবে উন্নত মানের এলিট শ্রেণীভুক্ত সমাজ পরিচালনাকারী।

সমাজের সাধারণ শ্রেণীর ক্ষেত্রে একই পুরুষের দ্বারা টেস্টটিউবে সন্তান উৎপাদন করা হবে। ফলে এক দলের দ্বারা উৎপাদিত সব সন্তানের মগজ-মেধা একই রকমের হবে। ইনকিউবিটরে জন্মলাভের পর এসব সন্তানেরা বিশেষ সংরক্ষিত এলাকায় থাকবে। শিশুরা হামাগুড়ি দেয়ার পর্যায়ে পৌছুলে পর একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সামনে অনেকগুলো বই রেখে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে তারা বইগুলো ধরতে গেলে ইলেকট্রিক শক লাগবে। পুনঃপুনঃ ইলেকট্রিক শক লাগার ফলে তাদের মধ্যে পুস্তকভীতি দেখা দেবে। বড় হয়ে তারা আর পড়াশুনা করবে না। তারা এলিট বা সুবিধাভোগী শ্রেণীর দাস হিসেবে তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। এভাবে নয়া সাহসী দুনিয়াতে দুটি শ্রেণী থাকবে-একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানী, সেনাপতি, প্রশাসক ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত এলিট শ্রেণী, আর একটি সাধারণ শ্রেণী যা হবে এলিট শ্রেণীর আজ্ঞাবহ দাস। হাক্সলি সাহেবের বইয়ের মোদ্দাকথা হলো, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি এবং সভ্যতার অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর মানবসমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি জ্ঞান, বিজ্ঞানী, সেনাপতি, প্রশাসক ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত এলিট শ্রেণী আর একটি সাধারণ মানুষের শ্রেণী যারা হবে এলিট শ্রেণীর আজ্ঞাবহ দাস শ্রেণী।

হ্যাক্সলি সাহেব ৫০০ বছর পরে তার কল্পনায় মানব সমাজের চিত্র এঁকেছেন। বই লেখার পর ৫০ বছর গত হয়েছে। তিনি যে সমাজের কল্পনা করেছেন তা পরিপূর্ণতা লাভ করতে এখনও ৪৫০ বছর বাকী। তবে এ ৫০ বছরে মানব সমাজ তার কল্পনার বাস্তব পথে বহুদূর এগিয়েছে বলতে হবে।

হ্যাক্সলি সাহেব মনে করেন যে, গর্ভধারণের প্রতি মানুষের অনীহা জন্মাবে এবং গর্ভনিরোধের জন্য যুবতী রমনীরা Chestity belt পরে থাকবে। এখন পর্যন্ত Chestity belt আবিষ্কৃত হয় নি বলে তা পরার রেওয়াজ চালু হয় নি। তবে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে পরিকাল্পিত সীমিত পরিবারের ধারণা মানুষের মনে দৃঢ়মূল হতে চলেছে। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মানুষ সন্তান জন্মদানের আগমনের পথে প্রতিরোধের প্রাচীর সৃষ্টি করে থাকে।

www.amarboi.org

প্রতিভাবান, ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষের দ্বারা প্রতিভাময়ী সুন্দরী রমনীদের ডিম্বকোষে উন্নতমানের মানুষ তৈরী করার উদ্যোগ চলছে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে Genetical Engineering নামে একটি শাখার উদ্ভব হয়েছে যা দ্বারা নাকি বার্নাড শ'য়ের কল্পনানুযায়ী Superman তৈরী করা সম্ভব হবে বলে বৈজ্ঞাণিকগণ বিশ্বাস করে। এসব কৃত্রিম প্রজননের দ্বার উৎপাদিত মানব সন্তানেরা হবে এলিট সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা হবে সমাজের উপরতলার লোক। এদের মধ্য হতে উদ্ভব হবে প্রশাসক, সেনাপতি, বিজ্ঞানী, বিচারক প্রভৃতি। এরা শাসন করবে সমাজ এবং প্রভুত্ব করবে জনসাধারণের উপর।

টেস্টটিউবে রক্ষিত একই পুরুষের বীর্য দ্বারা ইনকিউবিটরে এবং বিশেষ সংরক্ষিত এলাকায় প্রতিপালিত সাধারণ শ্রেণীর সন্তানেরা যখন হামাগুড়ি দিয়ে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সামনে রক্ষিত বইগুলো স্পর্শ করতে যাবে তখনই বৈদ্যুতিক শক খাবার ফলে তাদের মধ্যে পুস্তকভীতি উদ্রেক হবার কারণে বড় হয়ে তারা লেখাপড়া না শিখে মুর্খ হয়ে থাকবে আর সুবিধাভোগী এলিট শ্রেণীর দাসত্ব বরণ করে থাকার যে কল্পনা তার ইঙ্গিত আভাস ৪৫০ বছর বাকী থাকতে এখনই মিলতে শুরু করেছে। সমাজ সচেতন জ্ঞানী মানুষের সামনে এহেন অবমূল্যায়নের আলামত যথেষ্ট আছে। হ্যাক্সলি সাহেব এ অবমূল্যায়নের যে অমানবিক দিক তিনি তুলে ধরেছেন উহা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। তবে প্রসংগের প্রয়োজনে শ্রেণীবিন্যাস সৃষ্টির ধারণা দেবার অভিপ্রায়ে ঐ Blave New World -এর আংশিক উপস্থাপন করলাম। ইসলাম ঐ সকল অমানবিক ব্যবস্থার উৎখাত আদিকাল থেকে কিভাবে প্রয়াস চালিয়ে মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আমি সেদিকেই পাঠকদের নিয়ে যেতে চাই। Huxley সাহেব যান্ত্রিক যুগের ধারণা দিয়ে মানুষের বৈষম্যের বিভেদ ও বিরোধকে নিরূপিত করার চেষ্টা করবো। তাই কথিত এলিট বা কুলিনদের কাছ থেকে কিভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাঃ) দাস তথা অবহেলিতদের উদ্ধারের উদ্যোগ নিলেন উহাই এখন আলোচনা করবো।

দাসপ্রথাজনিত ব্যবস্থা উচ্ছেদে কোরান হাদিস

জ্ঞানের অভাবে যুগে যুগে যখনই এ মানবতার বিপর্যয় এসেছে তখনই আল্লাহতায়ালা নবী রসূলদের পাঠিয়ে ইসলামের বিধি ব্যবস্থায় মানবতার মানদন্ডকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেছেন, যাতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যহত না

www.amarboi.org

হয়। শেষ নবী মোহাম্মদ (সাঃ)কেও সেই বিধি ও ব্যবস্থার ব্যবহারিক বিষয়াদি দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে মানবতা উহার পূর্ণতায় ফিরে আসতে পারে। পূর্ণতার প্রয়োজনে যে ওহী উহার একটি Negative এবং অন্যটি Positive আবেদন ও আদেশ দিয়ে সমৃদ্ধ। তাই আমরা আল-কোরানের মধ্যে আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধসমৃদ্ধ আয়াতের আলোচনা দেখতে পাই। এ সকল আদেশের মধ্যে আমরা ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত নামক এবাদতগুলোর আদেশ দেখতে পাচ্ছি এবং ঐ সকল এবাদতের সাথে সাথে মানবতা বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী Negative approach-এর আদেশে মানুষকে জেনা, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মিথ্যা, হত্যা, ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশও দেখতে পাচ্ছি। নিষেধ সংক্রান্ত ঐ সকল অমানবিক অপরাধের জন্য আল্লাহ তাঁর আয়াতে বিচার ও শাস্তির বিধানও রেখেছেন। এখন প্রশ্ন হলো যে, Negative approach দিয়ে মানবতাকে তথা আশাফুল মখলুকাতকে খলিফা বিশেষণ দিয়ে মানুষকে ধন্য করতে জেনা, ব্যভিচার, মদ, জুয়া ইত্যাদিকে নিষেধ করে দিল। সেই Negative approach দিয়ে আল্লাহ কেন মানবতার কলংকমূলক সমকালীন দাসপ্রথাকে একটি স্পষ্ট আয়াত দিয়ে বন্ধ করে দিলেন না এবং দাসপ্রথাকে একটি স্পষ্ট আয়াত দিয়ে হারাম করা হলো না?

ঐ সকল প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরে সচেষ্ট না হয়ে বিরুদ্ধবাদীরা ইস্‌লামকে বহুলাংশে অমানবিক বিধান বলেও আখ্যায়িত করেছেন। অসংখ্য দাসীর সহঅবস্থানকে কেন্দ্র করে ইসলামকে যৌনাচারের ধর্মও বলেছেন। তাদের মতে ইসলাম যদি মানবতার বিকাশের বিধান হবে তবে কেন ইসলামের কোরান দাস প্রথার বিরুদ্ধে একটি কঠোর আয়াত দিয়ে উহাকে সমূলে উৎখাতের ব্যবস্থা করলো না! বরং বিরুদ্ধবাদীদের মতে ইসলাম ও তার কোরান দাসপ্রথা প্রতিরোধে তেমন কোন স্পষ্ট আয়াত তো নাজিল করেন নাই; অধিকন্তু দাস-দাসীর প্রসংগে বহু আয়াত নাজিল করেছে। আল-কোরানে দাস-দাসীর প্রসংগ থাকাতে বিরুদ্ধবাদীদের বিভ্রান্তমূলক বক্তব্যে বহুক্ষেত্রে তারা ইসলামকে অবমূল্যায়ন করেছে। আমি যতটকু দেখেছি তাতে তাদের এহেন প্রশ্নের উত্তর আমরা ঈমানদাররাও সঠিকভাবে উত্থাপন করতে পারি নি। বরং বিরুদ্ধবাদীদের এহেন উত্তর দিতে গিয়ে আমরা শুধু একথাই বলেছি যে, আমাদের নবী (সাঃ) তাঁর কর্মপদ্ধতির দ্বারা ঐ দাসপ্রথাকে উৎখাত করে গেছেন। কিন্তু আমরা বহুক্ষেত্রে পদ্ধতির প্রসঙ্গটাকে দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরতে পারি নাই।

www.amarboi.org

আসলে এটাই সত্য যে, নবী (সাঃ) তার কর্মপদ্ধতির অর্থাৎ সুন্নতের মাধ্যমে দাস-দাসী প্রসঙ্গের আয়াতের আমলের দ্বারা এহেন অমানবিক বিধানকে তুলে দিয়ে মানবিক মূল্যবোধকেই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আল কোরানের ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, এবাদতগুলোর হকিকতের যে বিধি ব্যবস্থায় মানুষকে সাম্যের ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, সেখানে দাস ও মনিবের মধ্যকার পার্থক্য থাকছে কোথায়? আল্লাহর প্রতি ঈমানের ডাকে সাড়া দেয়া পৃথিবীর সমস্ত ঈমানদার মানুষ যেমন সমতার মানদন্ড পেয়েছে, ঠিক তেমনি নামাজ, হজ্জ, যাকাত ও রোজার বিধানে পৃথিবীর প্রতিটি ঈমানদার সাদা-কালো গরীব-ধনী যেই হউক না কেন সেই আমলের কারণে মৈত্রীর বন্ধনেই বাধা পড়েছে। এটাই ছিল ইসলামের শিক্ষা।

একজন নামাজী সে দাস হোক, গরীব হোক অথবা আফ্রিকার কোন কালো লোকই হোক না কেন নামাজ ও হজ্জের বিধি ব্যবস্থায় কোনই প্রভেদ সৃষ্টি না করে তাকে সাম্যেরই শিক্ষা দেয়। এমন কি প্রয়োজনে মোমেন বাদশাহকে দাসের অথবা তার গরীব প্রজার পেছনে তার পায়ের কাছেই নামাজের সেজদা ফেলতে হয়। বাদশাহ বলে তাকে আলাদাভাবে নামাজের ব্যবস্থাকরণ ইসলামের শিক্ষা নয়। কারণ নামাজের শিক্ষাই হলো আল্লাহর সামনে নত হয়ে সাম্যের শিক্ষা নেয়া। এমনি করে রোজা, হজ্জ, যাকাতও ঐ মৈত্রীর মানবিক দর্শন দিয়ে পাঠানো হয়েছে। যাকাত ধনীকে নিয়ে গেছে গরীবের কুঠুরিতে। হজের মহামিলনে বিশ্বের সমস্ত ঈমানদার সাদা-কালো, ধনী-গরীব, ভৃত্য ও মনিব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় সেই আরাফাত ও কাবার তাউফে। ঠিক তেমনি করে রোজার অভুক্ত আত্মা ধনীদেরকে বুঝিয়ে দেয় দরিদ্রদের অভুক্ত থাকার কষ্ট ও কাতরতাকে। আর ঐ দর্শন ধনীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে গরীবের অভাব মোচনে। মৈত্রীর মিলনে ইসলামের এই যে আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক বিধান উহাকে উপেক্ষা করার মত কোন বিকল্প সুন্দর বিধান অন্য কোন মতাদর্শে পাওয়া যাবে কি? পাওয়া যাবে না। তবুও ইসলামের অবমূল্যায়নে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোরানের দাস-দাসী প্রসংগকে তাদের আলোচনায় আর একটি যুক্তি হিসেবে নিয়ে বলতে চায় যে ইসলাম দাস-দাসী প্রথার বিলুপ্তির পরিবর্তে উহার সংরক্ষণের মাধ্যমে মানবতার বিকাশকে প্রতিহত করেছে। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার পাঁয়তারায় বহু লিখেছে। ইদানীং

www.amarboi.org

তাদের শেষ লেখা 'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর লেখক সালমান রুশদি হুজুর (সাঃ) কে তার ক্রীতদাসী ব্যবহারকে অশ্লীল ভাষায় কটাক্ষ করে যে অমানুষিকতার পরিচয় দিয়েছে উহাকে আলোচনায় না এনে বরং আমার লেখা দিয়ে পাঠকদের বুঝাবার চেষ্টা করবো যে, সালমান রুশদিরা ইসলামের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কত অজ্ঞ। ইসলামের ব্যবহারিক জীবন ছাড়া যে আধ্যাত্মিক জীবন ও দর্শন উহা সাধারণভাবে সকলের কাছে ধরা না পড়ার কারণে রুশদিরা কত বিভ্রান্ত।

যাহা হউক আমি আমার প্রসংগ প্রত্যাবর্তন করে একথা স্পষ্টভাবে পাঠকদের বলছি যে, ইসলাম দাস-দাসী প্রথার প্রয়োজনকে আদৌ অনুমোদন দেয় না বরং ঐ ব্যবস্থা যে মানবতার জন্য কলংকময় এবং উহার উৎখাতের জন্যই যে ইসলামের আবির্ভাব একথাই আমার এ পুস্তকে আলোচিত হবে।

দাসপ্রথা সৃষ্টির আদি থেকে একটি অমানবিক প্রথা হিসেবে প্রতি যুগে যুগে স্বীকৃতি পেলেও আসলে ইসলামে আল্লাহ উহাকে কখনও কোরান পূর্ব কেতাবেও অনুমোদন দেয় নি। তবুও আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওহীর বাণী দিয়ে ঐ জঘন্য প্রথাকে কোন যুগেই একেবারে উৎখাত করতে পারেন নি। দাসপ্রথার উৎস মূলতঃ ক্ষমতার অপব্যবহারের স্বৈরাচারী শোষণের শিকার। কিন্তু পরবর্তীতে দাসদাসীদের ব্যবহার সামাজিক সংস্কারে রূপান্তরিত হয়ে যায় একথা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আর এ অধ্যায়ে ঐ সংস্কারের ইসলামিক সমাধান কিভাবে হলো তারই আলোচনা হবে।

মানুষ যখন তার সংস্কারের মাধ্যমে কোন একটি বস্তু বা বিষয়কে অভ্যাসগতভাবে আয়ত্ত করতে থাকে, তখন সেই বস্তু বা বিষয়ের মধ্য দিয়েই আল্লাহ মানুষকে সংশোধনের সন্ধান দিয়ে দেন। যেমন সূরা বাকারায় গাভী দিয়ে গাভী পূজার উৎখাত করা হয়েছে। তেমনি দাসদাসী রাখার সামাজিক সংস্কার সমাজ থেকে উৎখাতের বিধি বিধানে আল-কোরান দাস-দাসীদের প্রসংগে আয়াত নাজিল করে উহার উৎখাতের অবকাশ দিয়ে রেখেছে। কিন্তু দাসপ্রথার প্রচলিত ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেয় নি। বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের প্রয়োজনে আল্লাহ যদি জেনা, ব্যভিচার, চুরি, কেসাস, মদ ইত্যাদি আয়াতের মত দাসপ্রথাকে সমূলে উৎখাতের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে একটি আয়াত নাজিল করতেন, তখন কোন ঈমানদারদের পক্ষেই একটি দাসদাসীকে তাদের ঘরে রাখা হারাম হয়ে যেতো নাকি? মদের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ আয়াত অবতীর্ণ হলে প্রতিটি মোমেনকে যেমন মদের পিপাসাহ ঘরের বাইরে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিল,

www.amarboi.org

তেমনি দাস প্রথার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে যদি স্পষ্ট নিষিদ্ধকরণ কোন আয়াত আসতো তবে সেই মুহূর্তে ঘর থেকে তাদের দাস-দাসিদের তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হতো। তখন মানবতার অবমূল্যায়নে উল্লেখিত শ্রেণী সংগ্রামের সংঘাতে ইসলামের সাম্যের দর্শনে যে চরম আঘাত আসতো তাতে ইসলামের প্রচার আদৌ সম্ভব হতো কি? কখনই হতো না। তখন ইসলামের বিরুদ্ধশক্তি স্বাভাবিকভাবে এটাই প্রচার করতো যে, ইসলাম যেমন কোন সার্বজনীন ধর্ম নয়, তেমনি সর্বযুগেও উহার স্বীকৃতির স্মরণ অবাস্তব। বিরুদ্ধবাদীদের এহেন প্রচার ইসলামের সাম্যের স্মারণ উহার সূচনাতেই শেষ হয়ে যেত। অধিকন্তু তখনকার পৃথিবীর লাখো লাখো দাস মানুষ ইসলামের বিধান থেকে শুধু বঞ্চিতই হতো না; বরং বিতাড়ণের শ্রেণী সংগ্রামের শিক্ষায় আলাদা একটি ম্লেচ্ছ নিম্নশ্রেণীর ও বর্ণের মানুষ হিসেবে ইসলামের চরম শত্রু হয়ে যেত এবং তখন মানবতার একটি বিরাট অংশকে এমনিভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখে ইসলামের সাম্যের গীত গাওয়াও সম্ভব হতো না। বরং ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদের ঘরে অবস্থিত দুই শ্রেণীর মানুষের আলাদা উচ্চ ও নিম্নমানের অবস্থান অমানবতাই ফুটে উঠতো এবং আশরাফুল মখলুকাত অথবা খলিফা বিশেষণের ব্যাখ্যায় বিড়ম্বনাই আসতো। তাই ইসলামের কোরান Negative approachএ দাস-দাসীদের উল্লেখই উহার সমাধান দিয়ে গেছে। কোরান হাদিসের উদ্ধৃতির দ্বারা পাঠকরা বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ ও তার রসূল (সাঃ) কত হেকমতের সাথে ইসলাম পূর্ব দাসপ্রথাকে সমূলে উচ্ছেদ করে গেছেন। কোরান ও হাদিসের আকর্ষণীয় আয়াত দ্বারা ছাহাবীরা শুধু দাস-দাসী প্রথার উচ্ছেদে উদ্বুদ্ধ হয়নি, অধিকন্তু সাম্যের মহান মানদন্ডে দাস ও অদাসরা একাকার হয়ে একাত্মবাদকেই সাফল্যজনকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। মানদন্ডের মূল্যায়নের কারণে এবং আলোচনাকে ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনে কোরান হাদিসের বাণী এবং ছাহাবীদের আমলকে প্রাসংগিক পর্যায়ে উদ্ধৃত করবো যাতে পাঠকরা বিষয়টিকে বিশেষভাবে হৃদয়ংগম করতে পারেন।

প্রথমে আমরা সূরা বাকারার একটি আয়াত তুলে ধরবো। আল্লাহ বলেন-

وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ

অর্থঃ ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করবে (২ঃ১৭৭)

ঐ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার যে যে খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে তন্মধ্যে ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করাকে একটি বিশেষ পুণ্যের কাজ

www.amarboi.org

বলে আখ্যায়িত করেছেন। যে সমাজে লাখো লাখো ক্রীতদাস মালিকদের হাতে নিষ্পেষিত এবং অন্য মাল আস্‌বাবের মত হাটে বাজারে গরু ছাগলের ন্যায় বিক্রি হতো, সেই মানুষ সমাজের অংশ বিশেষ এহেন ক্রীতদাসদাসীদের খরিদ করে আজাদ করে দেয়াকে মোমেনদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদারীতে পরিণত হয়েছে। ঐ মুক্তির মাধ্যমে ক্রীতদাসদাসীরা শুধু মনিবের হাত থেকে মুক্তিই পেল না, অধিকন্তু তারা ইসলামের ছায়াতলে এসে খিলাফতী দায়িত্বে সচেষ্ট হতে পেরেছিলেন। আল্লাহর রসূল (সাঃ) জান্নাতের আশার বাণী দিয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাস বা দাসীকে মুক্ত করবে আল্লাহ তায়ালা দাসের এক এক অঙ্গের পরিবর্তে তার এক এক অঙ্গকে দোজখের আগুন হতে মুক্ত করবেন-এমন কি তার গুপ্ত অঙ্গকে উহার গুপ্ত অঙ্গের পরিবর্তে (মুতাফাকুন আলাইহ) (মেসকাত)।

শুধু খরিদ অথবা বিক্রি করেই দাসদের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই আল্লাহ তাদের সামাজিক মর্যাদাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে বলে দিলেনঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا

অর্থঃ 'তোমরা মুশরিক নারীদিগকে কখনই বিবাহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে। বস্তুত একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক শরিফজাদী অপেক্ষা অনেক ভাল।' (সূরা বাকারা ২২১)

সামাজিকভাবে সম্মানীয় করার প্রয়োজনে আল্লাহ সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে স্পষ্ট করে মুসলমানদের বলে দিলেনঃ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

অর্থঃ সেইসব মেয়েলোকদের স্ত্রীত্ব বরণ করে নাও, যারা তোমাদের মালিকানাভুক্ত হয়েছে'।

ঐ আয়াতের মালিকানাভুক্ত বলতে আল্লাহ ক্রীতদাসীদেরকে বুঝিয়েছেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের সাথে মিলনের পূর্বশর্ত হিসেবে তাদেরকে স্ত্রীত্বে বরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

www.amarboi.org

কথিত গোত্রীয়, বর্ণীয়, বংশীয় ও কৌলিন্যের অহংকারে মানুষকে বহুক্ষেত্রে একটি ভ্রান্ত বিভ্রান্তির মাধ্যমে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। তদানীন্তন আরবে এবং তার পূর্বেকার সমাজে ঐ গোত্রীয়, বর্ণী ও বংশীয় কৌলিন্যের মানসিকতাকে সমূলে উৎখাত করার জন্য আল্লাহ মানুষকে তাকওয়ার ভিত্তিতে কৌলিন্যের কামনাকে বিলুপ্তি করতে গিয়ে বৈবাহিক সূত্রের মাধ্যমে দাসপ্রথাকে তুলে নিলেন এবং বললেনঃ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান, তাদের বিবাহ দাও। তারা যদি গরীব হয় তাহলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দিবেন।' (সূরা নূর- ৩২)

সূরা নিসার ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ط

অর্থঃ আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বংশীয় মুসলিম মেয়েদেরকে বিবাহ করতে পারে না, সে যেন তোমাদের মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসীদের মধ্য হতে এমন নারীকে বিবাহ করে যে মমিনা হবে। (সূরা নিসা- ২৫)

উল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারা একথা কি বুঝা যায় যে ইসলাম দাসপ্রথাকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে চায় না? যে সকল কারণে সমাজের একজন নিম্নশ্রেণীর মানুষ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, উহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অন্যতম। কোন বংশীয় লোক যদি কোন নিম্নশ্রেণীর বা বংশের মানুষের ঘরের মেয়েকে নিজের স্ত্রীত্বে বরণ করে নিতে পারে, তখন অবশ্যই ঐ নিম্ন বংশের বা জাতের মানুষটি সমাজে সম্মানীয় হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এ পাওয়াটাও সাম্যের ও মৈত্রীর স্বীকৃতি।

আল্লাহর কাছে শ্রদ্ধেয় হবার জন্য যে তাকওয়া পরহেজগারী উহা কৌলিন্যের কারণে নয়। বরং সত্যিকার অর্থে পরহেজগারীর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে একজন মোমেন বা মোমেনা ক্রীতদাসী বংশীয় মুশরিক থেকে কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। ঐ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক একটি বিশেষ মূল্যায়ন। কৌলিন্যের শ্রেষ্ঠ শিরোমণি যাকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর

www.amarboi.org

কিছুই সৃষ্টি হতো না। সেই মহান ব্যক্তিত্ব হুজুর (সাঃ) আল্লাহর অনুমতির আয়াতে ক্রীতদাসীকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন। সূরা আহযাবে হুজুর (সাঃ) কে সেই অনুমতি দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ -

অর্থঃ 'সেই মহিলাদিগকে (হালাল করেছি) যারা আল্লাহর দেয়া দাসীদের মধ্য হতে তোমার মালিকানাভুক্ত হয়েছে' (সূরা আহযাব ৫০)

ঐ সূরায় ৫২ আয়াতে হুজুর (সাঃ) কে একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, বংশীয় স্ত্রী হজরত আয়েশা (রাঃ) হজরত সাওদা (রাঃ), হজরত হাফছা (রাঃ) এবং হজরত উম্মে ছালমা (রাঃ) ছাড়া যদি আরও কোন মহিলাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করতে চান তবে উহা শুধু ক্রীতদাসীদের মধ্য থেকেই সম্ভব হতে পারে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ط

অর্থঃ অবশ্যই দাসীদের অনুমতি তোমার জন্য রয়েছে (৩৩- ৫২)। তাই মুহাম্মদ (সাঃ) ক্রীতদাসী হজরত ছাফিয়া (রাঃ) কে স্ত্রীত্বে বরণ করে সাম্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাতে তার অনুসারীদের পক্ষে দাসদের প্রতি অমর্যাদাকর কোন নীতি প্রয়োগ করা আদৌ সম্ভব ছিল না।

যেখানে পৃথিবীর অন্য পাঁচটি বাদশাহর সামনে কুর্নিস প্রথায় পদধূলি নিতে হয়, সেখানে উভয় জগতের বাদশাহ হজরত (সাঃ) দরবারে দাস-দাসীদের যাতায়াত পারিবারিক পরিবেশে মানবতা পরম পূর্ণতা পেয়ে খেলাফতী দায়িত্বে সমঅধিকারে তারা ধন্যই হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ সূরা আযহাবে বলেন-

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ج

অর্থঃ নবীর স্ত্রীদের ঘরে তাদের পিতা পুত্র, ভাই, ভাইপো, ভাগ্নেয় তাদের সাধারণ মেলামেশার স্ত্রীলোকদের এবং তাদের ক্রীতদাস আশা যাওয়া করবে ইহাতে কোন দোষ নেই। (আযহাব ৫৫) এ ব্যাপারে হজরত ছাফীনা (রাঃ)-র

www.amarboi.org

একটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন- 'আমি বিবি উম্মে ছালমার দাস ছিলাম। একদা তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। তবে আমার শর্ত হলো তুমি যতদিন বেঁচে থাক রসূল (সাঃ) এর খেদমত করবে। আমি বললাম, আপনি শর্ত না করলেও আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন তাঁর হতে জুদা হবো না। ছফিনা (রাঃ) বললেনঃ অতঃপর তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন এবং ঐ শর্ত করলেন (আবু দাউদ)।

যিনি আশরাফুল মখলুকাতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ধরাতে এসেছেন এবং যিনি ঐ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রচারক ও নেতা তাকেই তো ঐ আদর্শের অনুকরণ করতে হবে আগে। নতুবা অন্য লোকে উহা গ্রহণ করতে যাবে কেন?

মানুষের মধ্যকার গোত্র, বর্ণ এবং জাতের কৌলিন্য বহুক্ষেত্রে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং এই বিভ্রান্তবাদের কারণে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকভাবে রক্ষিত হয় না। অথচ সকল মানুষকেই আল্লাহ আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। ক্রীতদাসীরাও যে আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি, তাদেরও যে কুলীনদের মত রক্ত, মাংস ও আত্মা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে- একথা কুলীনরা ভুলে যায়। কথিত কৌলিন্যের কারণে কোন কল্যাণ পৃথিবীতে আসছে কি? কল্যাণের কারণে কথিত কৌলিন্য নয়- বরং তাকওয়া ও পরহেজগারীতেই কল্যাণ এসেছে।

কোন একটি কর্মের কারণেও বহুক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে মানুষকে ম্লেচ্ছ বা নিম্নশ্রেণীর মানুষ বলে বিবেচনা করা হয়। আজও আমাদের দেশে কলু, জেলে, তাঁতী ইত্যাদি মানুষদেরকে সামাজিকভাবে সম্মানীয় মানুষ বলে বিবেচনা করেনা। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করতে অন্য মানুষ রাজি হবে না। মানুষের মধ্যে এহেন বিবেচনাবোধ মানবতার তথা আশ্রাফুল মখলুকাতের বিশেষণের প্রতি চরম আঘাত স্বরূপ এবং মানবতা বিকাশের অন্তরায়। মানুষে মানুষে পার্থক্যের এহেন বিবেচনা যে কত ক্ষতিকর উহারই সঠিক অনুধাবন ঐ মধ্যযুগে এবং কোরান পূর্ব পরিবেশে একেবারে লোপ পেয়েছিল। কথিত কুলীন মানুষেরা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদেরকে গরু ছাগলের মত শুধু হাটে বাজারে বিক্রিই করতো না, অধিকন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাদেরকে অসামাজিকভাবে অত্যাচার করতো। একই আদম (আঃ) থেকে আসার কারণে তারাও যে সৎভাব ও সদাচরণের প্রশ্নে সংসারে সমাজের অন্য পাঁচজনের মত ভাল ব্যবহারের দাবীদার এ মূল্যবোধকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ সূরা নিসায় বলেন,

www.amarboi.org

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ *

অর্থঃ পিতামাতার প্রতি ভাল ব্যবহার করবে, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের প্রতি এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি আত্মীয় প্রতিবেশীর পাশাপাশি চলার সাথী ও পথিকের এবং তোমাদের অধীনস্ত ক্রীতদাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর। (নিসা- ৩৬)

ঐ বাণীর সমর্থনপুষ্ট কয়েকটি হাদিসকে পাশে রাখলে পাঠকরা অনুধাবন করতে পারবেন যে দাসদাসীদের প্রতি অমানবতাজনিত আচরণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় হুজুর (সাঃ) কত যত্নবান ছিলেন।

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দাসদাসীকে খাবার ও পরার দিতে হবে এবং তাদের সাধ্যের অতীত কাজের ভার দেয়া যাবে না (মুসলিম)।

হজরত আবুজর গেফারী (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের ভাইদেরই তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং যার ভাইকে আল্লাহ তার ভাইকে অধীন করে দিয়েছেন সে যেন তাকে উহা খাওয়ায় যা সে নিজে খায় এবং উহা পরায় যা সে নিজে পরে এবং তাকে এমন কাজের ভার না দেয় যা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি এরূপ কঠিন কাজের ভার দেয়া হয় তবে সে যেন তাকে সাহায্য করে। (মেশকাত মুতাকা)

হজরত আবুজর গিফারীর (রাঃ) জীবন থেকেও একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি মারুর ইবনে সুয়াইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ 'আমি আবুজর গিফারীকে দেখলাম, তিনি এক জোড়া কাপড় পরিধান করে আছেন। তাঁর দাসও অনুরূপ একজোড়া কাপড় পরে আছেন। ঐ বিষয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমি এক ক্রীতদাসকে গালি দিয়েছিলাম। সে গিয়ে নবী (সাঃ)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তখন নবী (সাঃ) আমাকে বললেন, "তুমি কি তার মায়ের কথা বলে গাল দিয়েছ? তারপর বললেনঃ তোমাদের ভাইরাই তোমাদের খাদেম। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধিনস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে ভাই থাকলে সে নিজে যা খাবে তাই তাকে দেবে এবং নিজে যা পরিধান করবে তাই তাকে পরিধান

www.amarboi.org

করতে দেবে। আর তাদের উপর তাদের সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দিও না। এতদসত্ত্বেও কোন কষ্টকর কাজ দিলে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য কর" (বুখারি)।

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদিস দ্বারা আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের ক্রীতদাসদের প্রতি দয়া ও সদাচরণের আদেশ প্রদানে ইসলাম ক্রীতদাসদেরকে এমন উচ্চ মার্গে নিয়ে গেছে, যেখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আপন পিতামাতা ও ক্রীতদাসদাসী একই মানে উন্নীত হয়ে সাম্যের স্মরণীয় ইতিহাস রেখে গেছেন। আজকে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন নেই বললেই চলে। কিন্তু আপনার আমার সংসারে যে কাজের চাকর চাকরানীটি আছে, তাকে যদি আমরা নিজের ভাই ও বোনদের মত পোশাক আশাকে, আচার আচরণে আপন করে নিতে পারি, তখন একজন আগন্তুকের পক্ষে আমার সংসারে কে চাকর, আর কে আমার ভাই উহা বোঝা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি? তখন তার পক্ষে চাকর চাকরানীদের সম্পর্কে সম্পৃক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করা কি সম্ভব হবে? ইসলামের অনুসারীরা এহেন মানসিকতার মূল্যায়নে যদি মোমেন হতে পারে তবে সেখানে ক্রীতদাসদাসীর অথবা চাকর চাকরানীর পার্থক্য থাকলো কোথায়?

পারিবারিক পরিবেশে গৃহাভ্যন্তরে একজন মোমেন স্ত্রীলোক পর্দার প্রশ্নে যে কয়টি লোকের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারে তন্মধ্যে আপন দাসী এবং এ সকল দাস পুরুষ যাদের মনে অপবিত্র আকাংক্ষা পোষণ করার ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে স্ত্রীলোকদের পবিত্রতার প্রয়োজনে যে কয়টি মানুষের সাথে উঠাবসা করতে পারে উহার বিস্তারিত আয়াতের এক অংশে আল্লাহ বলেন,

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ -

অর্থঃ নিজের দাসী, সেইসব অধীনস্ত পুরুষ, যাদের অন্য কোন রকম গরজ নেই"। (নূর ৩১)

শুধু পারিবারিক পরিবেশে উঠাবসাই নয়, অধিকন্তু দাসদাসীদের সাথে এক সাথে বসে খানাপিনার তাগিদে হাদিস এসেছে। যেমন হজরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কারো জন্য খাদেম খানা তৈরি করে আনে, তখন সে যেন তাকে (খাদেমকে) নিজের সাথে বসায়, আর খাদেম যেন তা সাথে খায় কেননা সে উহার তাপ ও ধুয়া সহ্য করেছে। অবশ্য খানা যদি সামান্য হয় তবে যেন দুই এক লোকমা হলেও তার হাতে দেয়। (মুসলিম)।

www.amarboi.org

মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে একে অপরের মান ইজ্জত এমন কি পরস্পরের জীবনের যেন কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য তারা প্রকৃতিগতভাবে চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু মানুষ শয়তানী সত্ত্বার অনিষ্ট থেকে নিজেদের রক্ষা না করতে পেরে বহুক্ষেত্রে একে অপরের জীবনপাত করে থাকে। এ অহেতুক এবং অন্যায়ভাবে এহেন হত্যাকে ইসলাম কোন অবস্থায়ই স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করে না। বরং ইসলাম এহেন হত্যার প্রতিরোধে কেসাস বা রক্তপাতের নির্দেশ দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিয়েছে যে এহেন হত্যার কাফফারা স্বরূপ শুধু রক্তমূল্যই নয়, অধিকন্তু একজন মোমেন দাসকে আজাদ করে দিতে হবে। তাই আল্লাহর আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ -

অর্থঃ যে ব্যক্তি কোন মোমিন ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা করবে তার কাফফারাস্বরূপ তাকে এক মোমিন ব্যক্তিকে তার গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধীকারীকে রক্তমূল্য দিতে হবে। (সুরা নিসা ৯২)

দাসদাসীরা জীবিত হলেও তাদের গোলামীর কারণে তারা মনিবদের অমানবিক আচরণে মৃতপ্রায় মানুষ। সুতরাং একটি অযাচিত মৃত্যুর জন্য আর একটি মৃতসত্ত্বার আজাদ করার অর্থই হলো তাকে জীবন দেয়া। মৃত্যুর কাফফারা তো জীবনই হতে হবে। আর আল্লাহ এ বিধানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন জীবনের তথা ক্রীতদাসীদের মূল্যায়ন।

দাসদাসীদেরকে তাদের ত্রুটির জন্য সময় অসময় মারপিট করা তখনকার আরব সমাজে এবং ইউরোপীয় সমাজে একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ক্রীতদাসরাও যে মানুষ এবং তাদেরও যে ত্রুটি হতে পারে এ বিবেচনা না থাকায় ক্রীতদাসদাসীদেরকে নির্মমভাবে অত্যাচারের ইতিহাস আছে। যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ইসলাম ও উহার নবী (সাঃ) শুধু গোলামীর মুক্তির মূল্যায়নই রাখেন নাই, অধিকন্তু ক্রীতদাস-দাসীদেরকে যেন শারীরিক অত্যাচার করা না হয় সে বিষয়েও বিবেচনার বাণী রেখেছেন। হজরত ইবনু ওমর (রাঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে বিনা অপরাধে আপন দাসদাসীকে দণ্ডদান করেছে অথবা তাকে চড় মেরেছে তার কাফ্ফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া। (মুসলিম)

এ ব্যাপারে মুসলিম শরীফের আর একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। যেখানে হজরত আবু মাসুদ আনসারী (রাঃ) বলেনঃ 'আমি আমার এক

www.amarboi.org

গোলামকে প্রহর করছিলাম- এমন সময় পেছন হতে আওয়াজ শুনলাম, জেনে রাখুন আবু মাসুদ! তুমি উহার উপর যতটা ক্ষমতাবান আল্লাহ তোমার উপর ততোধিক ক্ষমতাবান। আমি পেছন দিকে ফিরলাম এবং দেখলাম তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ (সাঃ)। আমি বললামঃ "ইয়া রসূলুল্লাহ, সে এখন হতে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। তখন হুজুর (সাঃ) বললেনঃ শুন, যদি তুমি তা না করতে আগুন তোমাকে জ্বালাতো অথবা বলেছেন আগুন তোমাকে স্পর্শ করতো"।

উপরের উদ্ধৃত কোরানের কাফ্ফারা প্রশ্নে দাসমুক্তির বিষয়টি আমাদেরকে একটু মুখ্যভাবে বিবেচনা করতে হবে। দাসপ্রথা মানবতা হত্যার শামিল। দাসদের গোলামীর জীবন জীবন্মৃত্যুর মত। তাই একটি অবৈধ হত্যার বিনিময় রক্তমূল্যের সাথে আল্লাহ এহেন কাফ্ফারার মাধ্যমে আর একটি জীবনের সৃষ্টি করে দাসপ্রথাকে কতই না সুন্দরভাবে উৎখাত করে নিলেন। পারস্পরিক চুক্তি ভংগের কারণে দাসমুক্তি যেভাবে কাফ্ফারা হিসাবে মূল্যায়িত হয়েছে, ঠিক ঐ একইভাবে কাফ্ফারা হিসাবে দাসমুক্তি মূল্যায়িত হয়েছে আল্লাহর সাথে চুক্তি ভংগের কারণে। আজকের মত ইসলামপূর্ব ও পরের যুগেও মানুষ কথায় কথায় আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিল। অথচ কসমের মাধ্যমে কর্মের যে অঙ্গীকার সে করে বসে, উহা বহুক্ষেত্রেই পালিত হয় না। আরবের ঐ সময়ের সমাজে এহেন 'কসম' একটি কু অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, যা সর্বাবস্থায় পালিত না হবার কারণে কসমের গুরুত্ব অবহেলিত হয়ে আল্লাহর সাথে কসমের চুক্তি ভংগের প্রবণতা বেড়ে গিয়ে কর্মের অংগীকার সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হবার কারণে পারস্পরিক সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং একটি প্রতারণার প্রবর্তন শুরু হয়ে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হতে শুরু করলো। তাই সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার প্রয়োজনে অহেতুক কসম ভংগের কাফ্ফারা হিসেবে অন্যান্য বিধানের সাথে দাসমুক্তির বিধান করে বলে দিলেনঃ

أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ط

অর্থঃ কাফ্ফারা হিসেবে একটি দাসমুক্ত কর (সুরা মায়েদা- ৮৯)।

আশরাফুল মখ্লুকাত বিশেষণটির অবমূল্যায়নের উদ্বুদ্ধে যে অমানবিক আচার আচরণের সূত্রপাত, সেগুলোর সংশোধনে ক্রীতদাস-দাসীদের প্রসংগে অবতীর্ণ আয়াতই যেন আরাধ্য ছিল। তাই 'যিহারের' প্রশ্নেও দাস-দাসীর মুক্তির আয়াত এসেছে।

www.amarboi.org

তদানীন্তন আরব সমাজের মানুষের মধ্যে যিহার নামক একটি কু-অভ্যাস বা মানসিকতা বিরাজমান ছিল। আজও এদেশের কিছুসংখ্যক মুর্খ মুসলমানদের মধ্যে এ যিহারের মানসিকতা ফুটে উঠে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে কলহে অবতীর্ণ হয়। যিহার অর্থ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা। স্বামীরা স্ত্রীদের সাথে কলহের কারণে রাগের মাথায় বলে থাক্‌তো "তুই আমার পক্ষে আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মত হারাম"। একজন মোমেনের পক্ষে এহেন জঘন্য মানসিকতার সংশোধনের জন্য আল্লাহ সেখানেও কাফ্‌ফারা হিসাবে দাসমুক্তি বিধানের বন্ধন দিয়ে দাসমুক্তির উপর উহার প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন। যিহারের পরে কোন মোমেন যদি আবার স্ত্রীকে স্পর্শ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই একটি দাস মুক্ত করতে হবে। আর সে যদি দাসমুক্তি করতে অপারগ হয়, তবে তাকে তার হীন আত্মার চিকিৎসার জন্য একাধিক্রমে দুই মাসের রোজা রাখতে হবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط

অর্থঃ "যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করবে, পরে নিজেদের সেই কথা হতে ফিরে যায় যা তারা বলেছিল এবং পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে"। (মুজাদালা-৩)

আল্লাহ ভাল করেই জানতেন যে দাসপ্রথা হয়তো বা উঠে যাবে। কিন্তু শয়তানের বিভ্রান্তিকর পরিবেশের কারণে যিহারের কু-অভ্যাসের সংশোধনের জন্য আল্লাহ বিকল্প বিধান হিসেবে বলেছিলেনঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ
اَنْ يَّتَمَآسَّا ط

অর্থঃ আর যে দাস পাবে না, সে যেন ধারাবাহিকভাবে দুটি মাস রোজা রাখে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে লোক ইহা করতেও অক্ষম, সে যেন ষাটজন মিস্‌কিনকে খাবার খাওয়ায়।"। (মুজাদালা- ৪)

এহেন কাফ্‌ফারার কারণে এ কথা কি বুঝায় না যে আল্লাহ অত্যন্ত হেকমতের সাথে দাসদাসী প্রথার ব্যবহারকে সমূলে তুলে দিতে চান? আর ঐ

www.amarboi.org

উদ্দেশ্যের পেছনে আল্লাহ যে বিষয়কে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করতে চান উহাই মানবতার মূল্যবোধ যাতে খেলাফতী দায়িত্বে সকলে মিলেমিশে কাজ করতে পারে।

ইসলাম কোন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত বিধান নয়। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া মোমেনদের কর্তব্য। কারণ আদম (আঃ) কে পৃথিবীর জন্যই পাঠানো হয়েছে। ইসলামের বিধানের বাস্তবায়নে ও উহার কল্যাণকর দিকটার নমুনা হিসেবে কোন একটি ভূখন্ডে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে একটি রাষ্ট্র অবশ্যই প্রয়োজন হয়ে দেখা দিবে। সেই রাষ্ট্রে ইসলামিক সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক রূপায়ন সম্ভব হলে, ঐ রাষ্ট্র আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত অন্যত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন উহাতে বহুক্ষেত্রে বাতিলদের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হয়, সেই যুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের বিজয়ের সাথে শুধু গনিমতের মালই আসে না, অধিকন্তু বিজিত দেশের কিছু লোকও বন্দি হিসেবে আসে। এহেন গ্রেফতারকৃত বন্দিদের বিনিময় না হলে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে ঐ সকল যুদ্ধবন্দি বিজয়ীদের মালিকানা সত্ত্বের অধীনস্ত করে দেয়া হয়। সেই গ্রেফতারকৃত যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে যারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই গ্রেফতার হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে যাবে না। তখন উভয় স্বামী-স্ত্রীকেই একই ব্যক্তির মালিকানা সত্ত্বে দেয়া হবে। সেক্ষেত্রে মালিকদের পক্ষে গ্রেফতারকৃত স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের অধিকার থাকে না। কারণ ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীও একই সাথে গ্রেফতার হয়ে তারই কাছে আছে। অনৈসলামিক সমাজব্যবস্থায় মালিক তার মালিকানা সত্ত্বেও গ্রেফতারকৃত স্ত্রীলোকটির সাথে যৌন মিলন করতো এবং সেই যৌন মিলনের দায়দায়িত্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে নয়, বরং ব্যভিচারে। আর এ সকল গ্রেফতারকৃত স্ত্রীলোকদের গর্ভে সৃষ্ট সন্তান মালিকের সাথে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে কোন সম্পর্কিত ছিল না। ইসলাম ঐ সকল দক্ষিণ হস্তের মালিকানা অর্থাৎ যুদ্ধে লব্ধ স্ত্রীলোকদের সাথে যৌন মিলনের অধিকার দিয়েছে শুধু তাদেরই সাথে যারা স্বামীহীন গ্রেফতার হয়েছেন। কারণ ব্যভিচারকে এড়াবার জন্যে এবং স্ত্রীর মর্যাদায় যৌনক্ষুধার অধিকারেও বিশেষ করে বিনিময়ের ব্যর্থতায়। যৌনক্ষুধার অধিকার মানবিক অধিকার। ঐ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা মানে ঐ স্ত্রীলোকটি শারীরিক সৃষ্টি বৈকুল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, যার অর্থ হবে তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে বিকারগ্রস্ত করে তোলা। বাঁচার অধিকারে খাদ্য যেমন অপরিহার্য তেমনি যৌনক্ষুধাও একান্ত অপরিহার্য বিষয়। উহাকে ঘৃণা করে

www.amarboi.org

ক্ষুধার্তকে অবহেলা করা অবাঞ্ছিত। কারণ উহাতেই ব্যভিচারের বিবেচনা আসবে।

কিন্তু সেই অধিকার অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থার বন্ধনহীন যৌন স্বাধীনতা নয় এবং নয় উহা কোন দায়িত্বহীন অথবা জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা। অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে ঐ গ্রেফতারকৃত যুদ্ধবন্দির যেমন বিনিময়ের সুযোগ থাকে না, বরং তাদেরকে ক্রীতদাসের মানে বিবেচনা করে তাদের গরু-ছাগলের মত প্রয়োজনবোধে হাট-বাজারে বিক্রি করে। কিন্তু ইসলাম ক্রীতদাসীদের সাথে যৌনমিলনের সুযোগে কিছু শর্ত সাধিত করার আদেশ দিয়েছে। ইসলামী অনুশাসনে যুদ্ধলব্ধ ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধবন্দিদের সাথে যৌনমিলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সন্তান মালিকের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। এহেন মিলনের মাধ্যমে একজন ক্রীতদাসী যখন মালিকের কাছে স্ত্রীর মর্যাদা পায়, তখন সে আর ক্রীতদাসী থাকার সুযোগ পায় কোথায়? এহেন ব্যবস্থার মাধ্যমে দাসীর মানবিক কারণে যৌন অধিকার যেমন স্বীকৃত হয়, তেমনি এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যভিচারের সুযোগ থাকে না। বরং ইসলামী অনুশাসনে অধিকন্তু মালিককে সন্তান পালনের দায়িত্ববোধে বাধ্য হয়ে দাসীদের বিবাহে তৎপর হয়ে যায়।

হুজুর (সাঃ)-এর সময় এবং তার পূর্বে তখনকার সমাজে দাসপ্রথার প্রচলন অদাসদের একটি মজ্জাগত এবং স্বীকৃত ব্যবস্থা ছিল। ঐ অবস্থায় আল্লাহতায়ালা মদ, জুয়া সুদের ব্যভিচারের নিষিদ্ধকরণ মত একটি আয়াত নাজিল করে যদি হঠাৎ করে দাসপ্রথাকে বন্ধ করে দিতেন, তবে কোন অবস্থায়ই দাসপ্রথা বন্ধ হতো না, বরং লাখো লাখো দাস মানুষ একটি ম্লেচ্ছ সমাজের মানুষ হিসাবে আজও অদাসদের আওতায় অবহেলিত হতো যা কোন অবস্থায়ই খলিফা বা আশ্রাফুল মখ্‌লুকত বিশেষণের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা হতো না। সুরা বাকারায় বনি ইসরাইল কাওমকে যেমন গাভীর গোস্ত দিয়ে গাভী পূজা আল্লাহ বন্ধ করে দিলেন তেমনি দাসদাসীর উপর কর্তব্য সংক্রান্তে অসংখ্য আয়াত নাজিল করে দাস দিয়ে দাসদের ধন্য করলেন। দাস দিয়েই দাসপ্রথাকে উৎখাত করার এহেন সুন্দরতম ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

হুজুর (সাঃ) কোরানের আয়াতের বাস্তবায়নের প্রয়োজনে তাঁর জীবদ্দশায় দাসদাসীদের অভিভাবকত্বের ভূমিকা পালন করে গেছেন। ঐ অভিভাবকত্বের কারণে দাসদের মুক্তির প্রয়াসে এবং মনিবদের পাপের প্রতিদান দিতে বহু ধরনের

www.amarboi.org

কাফ্ফারার ব্যবস্থা শুধু মানবিক মূল্যবোধকে উল্লেখযোগ্যভাবে জাগ্রত করা তথা সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিল। আসলে ঐ কাফ্ফারার বিধান মানসিকভাবে মালিকদেরকে আঘাত করে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সংশোধনে এহেন দর্শনের ধারণা দেয়া হয়েছিল যে, আশাফূল মখ্লুকাত যে খেলাফতী দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল উহাকে তারা অবমূল্যায়ন করে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তাই কাফ্ফারার মাধ্যমেই দাসদাসীদের মুক্তি মূল্যায়িত হয়েছে মানবতায়। আয়াতের আইন দিয়ে একটি বিশেষ ব্যক্তির সংশোধনে সহায়ক হতে পারতো। কিন্তু যেখানে সামগ্রিকভাবে মানবগোষ্ঠীর অংশ বিশেষকে একটি অমানবিক আচরণে আবদ্ধ করে ফেলেছে, উহাকে হঠাৎ করে আইনের অনুশাসনে আদিষ্ট কোন কর্মপন্থায় সামগ্রীকভাবে হয়তো বা উৎখাত করা যেত, কিন্তু এ কর্মপন্থায় সংস্কারজনিত কোন পূর্ববিধি না থাকার কারণে উহা আর একটি অমানবিক অবস্থা সৃষ্টি করতো। অর্থাৎ হঠাৎ করে যদি মদ হারাম করার মত একটি আয়াত দিয়ে দাসদাসী রাখার প্রথাকে হারাম করে দেয়া হতো, তখন দাসদাসী এবং তাদের মনিব উভয়ই একটি সংকট ও সমস্যায় পড়ে যেত। কারণ দাসদাসীদের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার মানসিক প্রস্তুতির অভাব যেমন তাদেরকে বিব্রত করতো, তেমনি দাসদাসীরাও হঠাৎ করে তাদের ব্যবহার হারাম হয়ে যাবার ফলে তারাও নিরাশ্রয় হয়ে নিদারুণ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতো। নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবতো শুধু কলেমা পড়ানো নয় বরং কলেমার হাকিকতে সমাজ সংস্কারক হিসাবেই তাঁর প্রেরণ হয়েছিল। তিনি তো দাস ও মনিব উভয়ের জন্য এসেছিলেন। তাই যদি হয় তবে একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে মানবিক মূল্যবোধে পার্থক্য রেখে মোহাম্মদ (সাঃ) দাস ও মনিবদেরকে আলাদা আলাদা অবস্থানে বৈপরীত্য বিধানে মানবতার মূল্যায়নে সাম্যের সন্ধান দিতে পারতেন কি? পারতেন না বলেই হুজুর (সাঃ) মোমেনদের ব্যবহারিক জীবনে মানবতার মূল্যায়নের মাধ্যমে দাসপ্রথাকে তুলে দিয়ে দাস ও মনিবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়ে গেছেন।

মুহাম্মদ (সাঃ) এর আমলে এবং তার পূর্বেকার যামানার সমাজব্যবস্থায় মালিকরা দাসীদেরকে তাদের যৌনভোগের জন্যই ব্যবহার করতো না, অধিকন্তু তারা তাদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করতো। ইসলামের কোরান এহেন মানসিকতার সংশোধনের জন্য আয়াত নাজিল করে বলে দিলঃ

www.amarboi.org

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ -

অর্থঃ তোমাদের দাসীদেরকে নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না, যখন তারা নিজেরাই চরিত্রবতী থাকতে চায়। (নূর- ৩৩)

কাফ্ফারার করণিক বিধান ব্যতিরেকেও যদি কোন দাস এবং তার মালিকরা তাদের পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি পেতে চায় অর্থাৎ কোন দাস বা দাসী তাদের মালিক হতে যদি মুক্তির জন্য মালিককে বিনিময় অর্থ দেবার প্রস্তাব করে এবং মনিব তা কবুল করে, তখন উভয়ের মধ্যে চুক্তিপত্র লিখে দাস বা দাসী মালিকের গোলামী হতে মুক্তি পেতে পারে। সে ব্যাপারেও আল্লাহতায়ালা তাঁর কোরানে বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا -

অর্থঃ "আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্য হতে যারা চুক্তিপত্রের দরখাস্ত দেবে তাদের সাথে চুক্তিপত্র কর, তোমরা যদি জানতে পার যে তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে"। (নূর - ৩৩)

এহেন চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মালিকদের গোলামী হতে মুক্তির প্রয়োজনে মালিক ইচ্ছা করলে বিনিময়কৃত কিছু অর্থ মাফও করতে পারে। অথবা অন্যকোন মুসলমান কিংবা রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকেও ঐ দাস ও দাসীদেরকে অর্থ দিয়ে মালিকদের কাছ হতে আজাদ করে দেয়ার উৎসাহেও আল্লাহর বাণী এসেছে। সেখানে আল্লাহ বলেন- وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتٰكُمْ

অর্থঃ (তোমাদের মুক্তির জন্য) তোমাদের সেই মালসম্পদ হতে দাও আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন। (নূর- ৩৩)

ক্রীতদাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতগুলো আমলের মাধ্যমে মোহাম্মদ (সাঃ) ঐ সময়ই নয়; অধিকন্তু তার পূর্ববর্তী যুগের জগতের ক্রীতদাসদের ব্যবহারকে অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়ে গেল। সেই বিবেচনার

www.amarboi.org

সমর্থনে আমি আরও কয়েকটি হাদিস পাঠকদের সামনে তুলে ধরবো যাতে পাঠকরা বুঝতে পারেন যে, ইসলাম কিভাবে এবং কত সূক্ষ পথে ক্রীতদাস প্রথাকে সমূলে উৎখাত করতে পেরেছে। আজ বিশ্বের কোন মুসলমানদের ঘরে দাসদাসীদের ব্যবহার আছে এমন কোন প্রমাণ নেই। বরং অমুসলমানরাই এর ব্যবহারকে আজও কোথায়ও কোথায়ও জিইয়ে রেখেছে। মুসলমানদের ঈমানের আমলের প্রশিক্ষণে নবী (সাঃ) এর বাণীকে তারা যেভাবে মেনে নিয়েছে তাতে ক্রীতদাসীদের ব্যবহার যে মানবিক নয় এ ধারণায় তারা সমৃদ্ধ। আয়াতে করিমায় ক্রীত দাসদাসীদের ব্যবহার সংক্রান্ত স্পষ্ট হারামের আয়াত না থাকার কারণে এখ্‌তেলাফের অবকাশ আছে সত্য-কিন্তু হুজুরের হাদিস এমনভাবে এসেছে যাতে সমস্ত এখ্‌তেলাফের বিলুপ্তি ঘটিয়ে একথা চিরভাস্বর হয়ে উঠেছে যে সাম্যের সহ-অবস্থানের সন্ধান দিতে গিয়ে হুজুর (সাঃ) বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে কারা নিকৃষ্টতম উহা বলে দেবো কি? যারা একাকী খায়, দাসদের বেত মারে এবং কাহাকেও কিছু দেয় না"। (হাদিস)

মুসলমানদের ইহকালীন কর্মের উপর নির্ভর করে যে জান্নাত ও জাহান্নাম, সেখানে জান্নাতের পুরস্কার তারাই পাবে যাদের সম্বন্ধে হুজুর (সাঃ) বলেনঃ

"যে দাসদের সাথে দুর্ব্যবহার করে সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। এবং যে দাসরা ছালাত কায়েম করে তারাই তোমাদের ভাই"। (হাদিস)

আরবের তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় গরু-ছাগলের মত হাটে বাজারে দাসদাসীদের এবং প্রয়োজনবোধে এদের শিশু বাচ্চাদেরকে আলাদাভাবে বিক্রি করে দিত, যেমনি করে আমাদের দেশের মানুষ গরুকে রেখে গরুর বাচ্চাকে অথবা বাচ্চাকে রেখে গরুকে বিক্রি করে দেয়। মানব শিশু এবং তাদের এহেন বিক্রি যে কতটা অমানবিক উহার বিবেচনায় হুজুর (সাঃ) বলেনঃ "যে সন্তান আর তার মাকে পৃথক করেছে (অর্থাৎ মা ছাড়া সন্তান বেচেছে অথবা সন্তান ছাড়া মাকে বেচেছে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে এবং তার প্রিয়জনদেরকে পৃথক করবেন"। (তিরমিজী)

হজরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "একবার তিনি একটি দাসী ও তার সন্তানকে পৃথক করে বিক্রি করলেন। নবী (সাঃ) তাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। সুতরাং তিনি ঐ কেনাবেচা ভেঙ্গে দিলেন।" (আবু-দাউদ) এ ধরনের অমানবিক আচরণকে আল্লাহর রসূল (সাঃ) এমনভাবে ঘৃণা করতেন যে এ প্রসংগেও কয়েকটি হাদিস এসেছে। যেমন হজরত আবু মুছা আশ্‌-আরী (রাঃ) বলেনঃ "রসূল (সাঃ) সেই ব্যক্তিকে লানত করেছেন যে বিক্রিকালে বাপ-পুত্র বা ভাই

www.amarboi.org

ভাইকে পৃথক করে"। (মেসকাত) হযরত আব্দুল্লাহ-বিন মাছুদ (রাঃ) বলেনঃ নবী (সাঃ) এর নিকট যখন বন্দিদের আনা হতো তিনি একজনকে পুরা এক পরিবার দান করতেন। তিনি পছন্দ করতেন না তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটুক"। (ইবনে- মাজা)

ক্রীতদাস প্রথা মূলতঃ অনধিকার সর্বস্ব একটি জুলুমী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাটি সাধারণত মানুষের পৈশাচিক প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ, যা ক্ষমতাশীলদের সংঘাত থেকে অথবা যুদ্ধ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়। সৃষ্টির আদি থেকে যুগে যুগে, দলে দলে, গোত্রে গোত্রে এবং জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, সেই যুদ্ধে বিজিতদের বশ করে রাখার একটি মানসিকতাই মূলত ক্রীতদাস প্রথা।

ঐ ক্রীতদাস প্রথা কয়েকটি কারণে সমাজে স্বভাবসিদ্ধ হয়েছিল যার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জৈবিক কারণগুলো অন্যতম। যেহেতু ক্রীতদাসদাসীদেরকে বিক্রি করে কিছু অর্থ উপার্জন সম্ভব ছিল, তাই অর্থনৈতিক স্বার্থেই প্রথমত বিজিতদেরকে বশে রাখার অভিলাষ ক্রীতদাস ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়ত দক্ষিণ হস্তের অধিকরণের দরুন যখন বিজাতিরা একবার সামাজিকভাবে ক্রীতদাস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়, তখন সামাজিক মূল্যবোধের কারণে মনিবদের মানসিকতার একটি বৈষম্যের বিবর্তন মনিব ও ক্রীতদাসদের মধ্যে একটি বিরোধের মান বিবেচিত হয়ে ক্রীতদাসরা নিম্নমানের জীব হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়। কালের বিবর্তনে এ ব্যবস্থাটির পরিবর্তন কোরানপূর্ব জমানায় সম্ভব হয়ে না উঠার কারণে সামাজিকভাবে বংশানুক্রমে তারা মনিবের গোলাম হিসেবে মনিবের কাজে ব্যবহারিত হয়ে আসছিল।

তৃতীয়তঃ জৈবিক জিজ্ঞাসার যৌনাচার বিজয়ী মনিবদের একটি অদম্য কামনায় বিজিতদের স্ত্রীলোকদেরকে ক্রীতদাসীদের মর্যাদা দিয়ে তাদের সাথে যৌন মিলন একটি স্বাভাবিক বিষয়ে রূপ নেয়। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর হাতে কলেমা পড়ার পরেও কোন কোন মনিবরা তাদের দাসীদের সাথে স্ত্রীদের মত সহবাস করে চলছিল। এহেন সহবাসকে তারা অপরাধ মনে না করে বরং তাদের অধিকার মনে করতো। বহুক্ষেত্রে যুদ্ধগুলো এ জন্যও করা হতো, যাতে তারা তাদের প্রতিপক্ষ মেয়েদেরকে হস্তগত করতে এবং তাদেরকে দাস বা দাসী বানাতে পারে। এ ব্যাপারে তৎকালীন আরবের জাহির-বিন- আবি- ছালমার একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেন যে, তারা যখন রবীয়বাসীদের উপর আক্রমণ চালায় তখন তারা যুদ্ধে জয়লাভ করে বড় বড় চুলওয়ালা মেয়েদেরকে বাঁদি বানিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ঐ সকল মেয়েরা সূর্য উদয়

www.amarboi.org

হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকতো এবং তাদের মিষ্টি মুখের লালা সুর্যের আলোতে ঝকঝক করতে থাকতো। এমনিভাবে হারেজ-বিন-হালিঝা নোমান-বিন মানদারের একটি আক্রমণের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ "আমরা বনু তামিমের উপর ঝুঁকে পড়লাম এবং মাহে হারামে উহাদেরকে গিয়ে ধরে ফেললাম এবং তাদের মেয়েদেরকে বাঁদি বানালাম"। বহুক্ষেত্রে ঐ সকল ক্রীতদাসীদের সাথে 'আজলের' ভিত্তিতে সহবাস করতো যাতে ক্রীতদাসীদের পেটে সন্তান জন্ম না নেয়। কারণ সন্তান পালনের ঝুঁকি এবং তাদেরকে মনিবের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী করা মনিবরা সমীচীন মনে করতো না। তাছাড়া সন্তান সম্ভবা ক্রীতদাসীদেরকে হাটেবাজারে বিক্রি করা ঝামেলাবহুল হওয়াতে যৌনমিলন মূলতঃ আজলের ভিত্তিতেই স্বাভাবিক করে নিলেও মানবিক মূল্যায়নে ইসলাম উহাকে স্বীকার করে নেয় নি। তাই ইসলাম ক্রীতদাসীদের সাথে যৌনমিলন বৈবাহিক সূত্রে এবং সন্তানের উত্তরাধিকারী শর্তে এমন কতগুলো বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে দেয়, যাতে পরবর্তীকালে ক্রীতদাসীদের সাথে অবৈধ যৌনমিলন আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

মোহাম্মদ (সাঃ) কোরানের আলোকে যুদ্ধের নীতি, যুদ্ধবন্দিদের বন্টনের নীতি বেধে দেয়ার ফলে যুদ্ধে লব্ধ ক্রীতদাসীদের সাথে যৌনমিলন যৌনাচার না হয়ে বরং বৈবাহিক সূত্র সম্বন্ধে এমন হয়ে গেল যে যুদ্ধে লব্ধ মেয়েলোক বিনিময়ের বিকল্পে কারো না কারো স্ত্রীতে পরিণত হয়ে গেল। মোহাম্মদ (সাঃ) তার নিজের জীবনাচরণ দিয়ে উহা প্রমাণ করে গেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে হজরত জোয়ায়ারিয়া (রাঃ) ছিলেন যুদ্ধবন্দি। অন্য বন্দিদের মত তিনিও বন্টন হন। এবং সাবেত - বিন- কায়েয়েরের ভাগে পড়েন। তিনি হুজুর (সাঃ)-এর নিকট হতে অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে তার মনিব কায়েয়েরের নিকট হতে মুক্তি নিয়ে মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হন। জোয়ায়ারিয়া (রাঃ) ছিলেন একটি গোত্রপতির কন্যা এবং সেই গোত্রের সহস্রাধিক লোক হজরত সাহাবী (রাঃ) হাতে বন্দী হন। সাহাবী (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে জোয়ায়রীয় (রা)-এর সাথে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিবাহ হয়েছে তখন তারা মহানবী (সাঃ)-এর সম্মানে স্ব স্ব দাসদাসীদের মুক্তি করে দেন। হজরত আয়শা (রাঃ) তখন বলছিলেন যে, "জোয়ায়ারিয়া (রাঃ) সাথে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিবাহ হওয়াতে বনি মুসতালেক গোত্রের শত শত পরিবার আজাদ হয়ে গিয়েছিল। একটি গোত্রের জন্য জোয়ায়ররীয়া (রাঃ) মত ভাগ্যবতী মহিলা অন্তত আমার চোখে পড়ে নি"।

www.amarboi.org

হুজুর (সাঃ)-এর অন্য একজন স্ত্রী ছিলেন হজরত সাফিয়া (রাঃ)। তিনি ছিলেন বনি নজির গোত্রের সর্দার হোয়াই ইব্‌নে আখতারের কন্যা। খয়বর যুদ্ধে সাফিয়ার স্বামী কেনানা নিহত হয় এবং সাফিয়া বন্দি হন। হুজুর (সাঃ) সাফিয়াকে মুক্তি দিয়ে তার সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে তারই সুপারিশে নজির গোত্রের বন্দিদেরকে আজাদ করা হয়। নজির গোত্রটি ছিল ইহুদী। আর ঐ বিবাহের দ্বারা ইসলামের আর একটি বিজয় সূচিত হলো এবং এতে ইহুদীদের একটি বিশেষ অংশ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধবন্দিদের যেখানে যৌনাচারের জুলুম ছিল, সেখানে ইসলামের মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর কোরানের আয়াত যে ব্যভিচারহীন এবং সাম্যের সমাজ গড়েছে তার তুলনা হবার কথা নয়। তবুও সাল্‌মান রুশদির গোষ্ঠীদেরকে বলতে হচ্ছে যে মোহাম্মদ (সাঃ) যা করেছেন উহা বোঝার জন্যে কোরানপূর্ব সমাজের অবস্থা অবশ্যই তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে।

মোহাম্মদ (সাঃ) একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে দ্বীনের মূল নীতিমালা প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন। সংস্কারকদের জীবন উপমার উপকরণ না হলে সমাজ তা গ্রহণ করতে চাইবে কেন? তাই মোহাম্মদ (সাঃ) এর একাধিক ক্রীতদাসী বিবাহ আল্লাহর অনুমোদন সম্পর্কে ও উপমার উপকরণে সংঘটিত হয়েছে। মোহাম্মদ (সাঃ) যদি ক্রীতদাসীদের বিবাহ না করতেন; তবে মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের জন্য মানবতার মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রীতদাসী বিবাহ হারাম হয়ে যেত। আর সেক্ষেত্রে আশরাফুল মখ্‌লুকাতে ফাটল ধরে দাস ও মুনিব নামে দুটো জাত মানবগোষ্ঠীকে পৃথক করে রাখতো এবং তখন ইসলাম ও আল্লাহর ধারণায় অবতীর্ণ কোরান খোদা নাখাস্তা "স্যাটানিক ভার্সেস" আখ্যায়িত হয়ে যেত। কিন্তু মহানুভব আল্লাহর ইচ্ছা তা নয়। তাই আল্লাহ মানুষকে দিয়েই মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। কিন্তু ক্রীতদাস প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট আয়াত এসে উহার ব্যবহারকে হঠাৎ করে মদের মত হারাম করে দিলে ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটতো কি? হতো না। সেক্ষেত্রে বিষয়টি হারাম হয়ে যেত সত্য, কিন্তু ক্রীতদাস প্রথাটি উঠে যেত না। অথচ জেনা, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, বিনা কারণে হত্যা ইত্যাদির হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত থাকা সত্ত্বেও ঐ অপরাধগুলো সমাজ থেকে উঠে যায় নাই। জেনা, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি অমানবিক অভ্যাস ব্যক্তিভিত্তিক বিষয়। তাই ঐগুলোকে আইন করে বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন সামগ্রিকভাবে মানবগোষ্ঠীর একটি বিশেষ অংশকে

www.amarboi.org

নিয়ে যখন অনিয়মতান্ত্রিক হলেও মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, তখন আইনের আয়াত সেখানে অপ্রযোজ্য হয়ে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠতো। তাই আল্লাহ তার আয়াতে ক্রীতদাসদাসী সংক্রান্ত Negative approach দিয়ে এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যবহারিক জীবনের আদর্শে প্রথার প্রচলনকে পর্যায়ক্রমে পরাভূত করে প্রমাণ করে দিলেন যে মানুষ কোন মানুষের গোলাম হতে পারে না। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের অনুসারী সাহাবীদের জীবনে দাসদাসীদের ভাই-বোন অথবা জামাই-স্ত্রীতে বরণ করে আত্মীয়তার বন্ধনে আত্মার মানুষ হয়ে গেছেন এবং বহুক্ষেত্রে ক্রীতদাসদাসীদেরকে আজাদ করে সমাজের অন্য পাঁচজন সম্মানীয় ব্যক্তিদের সমান করে দিয়েছেন। ক্রীতদাসীদের সম্মান কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ উপস্থাপন করলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর প্রতি ওহী করা কোরান কত উচ্চ দর্শনে দাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে।

ঘটনাটি ছিল হুজুর (সাঃ)-এর নাতি হজরত হোসাইন (রাঃ)- সংক্রান্ত। হজরত হোসাইন (রাঃ) সেদিন খেতে বসেছিলেন। ঐ সময় একজন দাসী-পরিচারিকা খাবার পরিবেশন করছিল। পরিচারিকা গ্লাস ভর্তি পানি নিয়ে হজরত হোসাইন (রাঃ)-এর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ তার হাত থেকে গ্লাসটি পড়ে গেল। পরে গ্লাসটি ভেঙ্গে গেল এবং ছিটকে পড়া পানি ভিজিয়ে দিল হজরত হুসাইন (রাঃ)-এর জামা কাপড়। বিরক্ত হুসাইন (রাঃ) খুব রাগান্বিত দৃষ্টিতে পরিচারিকা দাসীর দিকে তাকালেন। জ্ঞানী পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ কোরানের এই আয়াত আবৃত্তি করলেনঃ 'আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা ক্রোধ সংযত করে এবং লোকদের ক্ষমা করে'। হোসাইন (রাঃ) শান্ত হলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। পরিচারিকা কোরান মজিদ থেকে আবার আবৃত্তি করলেনঃ 'আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।' ঐ আয়াত শুনে হজরত হোসাইন (রাঃ) চিৎকার করে উঠলেন এবং বললেনঃ 'দাসবৃত্তির শৃংখল থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।' (আবু সোহায়েব)

মোহাম্মদ (সাঃ) কাছে আসা ওহীর আধ্যাত্মিকতা যখন সুমহান সাম্যের সংগীত বেজে উঠলো, তখন ঐ সংগীতের স্বাভাবিক আকর্ষণে বিমোহিত হয়ে যখন ক্রীতদাসরাও ইসলাম গ্রহণ করে মনিবদের মর্যাদার মূল্যায়ন হতে থাকলো তখন বহু মনিবদের যে ক্ষোভের সঞ্চার হলো তাতে বহু ক্রীতদাসদের অত্যাচারিত হতে হয়েছে। তবুও তাঁরা ইমানহারা হয় নি। এ প্রসংগে হজরত

www.amarboi.org

খাব্বাব (রাঃ) কে উল্লেখ করা যেতে পারে। হজরত খাব্বাব (রাঃ) ছিলেন একজন স্ত্রীলোকের ক্রীতদাস। স্ত্রীলোকটি যখন জানতে পারলো যে, তার ক্রীতদাস খাব্বাব মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মগ্রহণ করেছে, তখন বিচিত্র উপায়ে তাকে শাস্তি দিতে লাগলো। প্রথমে তাকে লোহার বর্ম পরিধান করিয়ে আগুন ঝরা রোদে শুইয়ে রাখতো। গরমে তার শরীর সিদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু ঐ শাস্তিতেও যখন তাঁর মত পরিবর্তন হলো না, তখন তাকে খালি গায় মরুভূমির গরম বালুতে শুইয়ে রাখা হতো। এতে তার দেহের মাংস পর্যন্ত গলে যেতো। মাঝে মাঝে লৌহ শলাকা দিয়ে তার মুখে ও মাথায় দাগ দেয়া হতো। এমন কি অমানবিকভাবে খাব্বাবকে জ্বলন্ত অংগারের উপর শুইয়ে রাখা হতো। কিন্তু কোন শাস্তি তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারলো না

হজরত ওমর (রাঃ) যখন খলিফা হলেন, তখন একদিন হজরত খাব্বাবকে কোরেশদের নির্যাতনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। হজরত খাব্বাব (রাঃ) তাকে কোমর খুলে দেখালেন। চমকে উঠে ব্যথিত হৃদয়ে ওমর কে বললেনঃ 'আমার মনিব আমাকে জ্বলন্ত অংগারের উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখতো, ফলে আমার কোমরের মাংস গলে যেত। প্রতিদিন এরূপ করায় আমার কোমর এরূপ পাতলা ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। (আবু সোহায়েব)

পাঠকরা খাব্বাব (রাঃ)-এর ঐ ঘটনা থেকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ইসলামের সামগ্রিক কোরান সাম্যের আহ্বানে কত উদার ছিল। আর সেই উদারতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খাব্বাব (রাঃ) মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে ঈমানের ইতিহাস রেখে গেছেন। নবী (সাঃ)-এর কাছে দাসপ্রথার ব্যবহার যে কত ঘৃণিত ছিল উহা নিম্ন হাদিস থেকেও অনুধাবন করা যেতে পারে। হজরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বলেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির দুশমন হবো। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। আজাদ মুক্ত মানুষ বিক্রি করে তার অর্থ খেয়েছে, আর যে ব্যক্তি কাউকে মজুরী নিয়ে পুরাপুরি কাজ আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু তাকে মজুরী দেয় নি।

হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে আর একটি হাদিসে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'একদিন হজরত রসূল (সাঃ) আবু বকরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তখন তার এক গোলাম সম্পর্কে অভিশাপমূলক বাক্য উচ্চারণ করছিলেন। রসূল (সাঃ) তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, ক্বাবার মালিকের

www.amarboi.org

শপথ এটা হতেই পারে না যে, যে ব্যক্তি অভিশাপ দেবে সে সিদ্দিক (সত্যবাদী) হিসাবেও পরিগণিত হবে। এ ঘটনার পর হজরত আবু বকর (রাঃ) ঐ গোলাম আজাদ করে দিলেন এবং রসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন ভবিষ্যতে এমন আর হবে না। (বায়হাকী)

ইসলাম মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কিভাবে এবং কত মহত্ত্বের মহানুভবতার দ্বারা সফলতা অর্জন করেছিল তার আর এক ইতিহাস পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। ঘটনাটি হজরত ওমর বিন আব্দুল আজিজের খেলাফতের আমলে। তিনি খলিফা নির্বাচিত হবার পর প্রাসাদের দিকে চলছেন। রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে দাঁড়ানো আছে সৈন্যদল। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? উত্তর এলো, এরা আপনার দেহরক্ষী সৈন্য। খলিফা বললেন, প্রয়োজনমত এদের পাঠিয়ে দাও। আমার দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই। জনগণের ভালবাসাই আমার প্রতিরক্ষা। প্রধান সেনাপতি সশস্ত্র সালাম জানিয়ে তার নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পরে ওমর বিন আব্দুল আজিজ প্রাসাদে ঢুকলেন। দেখলেন সেখানে আটশত দাস তার অপেক্ষায় দন্ডায়মান। জিজ্ঞেস করে জানলেন যে এরা তারই সেবার জন্য। খলিফা প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, এদের মুক্ত করে দিন। আমার সেবার জন্য আমার স্ত্রীই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী তার হুকুম তামিল করলেন (আবু সোহায়েব)। হুজুর (সাঃ)-এর অনুসারীদের এই যে মানব মূল্যবোধ এটা সম্ভব হয়েছে হুজুর (সাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়নে। ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় 'কেছাছ' অর্থাৎ বিনিময়ের বিধান বিবেচনা করা হয়। কিন্তু হুজুর (সাঃ) ক্রীতদাসদের ব্যাপারে সেই 'কেছাছের' বিধান বিবেচনা না করে বরং আরও কঠোর মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে তার আপন ক্রীতদাসকে হত্যা করবে আমরা তাকেই হত্যা করবো এবং যে আপন দাসের অঙ্গ ছেদন করবে আমরা তার অঙ্গ ছেদন করবো।' (তিরমিজি আবু দাউদ) ঐ হাদিসটির বর্ণনাকারী ছিলেন তাবেয়ী হাসান বসরী (রাঃ), যিনি সাহাবী হজরত ছামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। উল্লেখিত কোরানের আয়াত ও হাদিসের পরে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের এ কথা বলার আর অবকাশ থাকলো না যে, ইসলাম দাসপ্রথাকে আদৌ প্রশ্রয় দিয়েছে। বরং একটি ব্যাধিকে ব্যতিক্রম ধর্মী চিকিৎসায় নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হুজুর (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কামিয়াবী হয়েছেন। এ কারণে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে আজ দাসদাসী ব্যবহারের প্রচলন নেই বললেই চলে।

www.amarboi.org

অধিকন্তু ক্রীতদাসীদের একটি বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তাঁরা শুধু আরবেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না বরং দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ইসলামের ছায়াতলে তাঁরাই শুধু শান্তির স্মরণিক স্বাদ পেয়েছিলেন তা নয়; অধিকন্তু তাঁরা সুদূর আরব থেকে এ উপমহাদেশে ইসলামের তবলিগ করে গেছেন। উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম পরিবার যারা ১২০০ সাল হতে ১২৯০ সাল পর্যন্ত ভারত শাসন করেছেন তাদেরকে ইতিহাস দাসবংশ বলে আখ্যায়িত করলেও তারা তাদের সুশাসনের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। পরবর্তীকালে ঐ দাসবংশের অনুসারী হিসেবে ১২৯০-১৩২০ সাল পর্যন্ত খিলজী, ১৩২০-১৪১৩ সাল পর্যন্ত তোগলক ১৪০১-১৫২৬ সাল পর্যন্ত লুদি, ১৫৩৯-১৫৫৫ সাল পর্যন্ত সুর বংশ এবং ১৫২৬-১৫৩৯ ও ১৫৫৬-১৭৫৫ সাল পর্যন্ত মুঘলরা এ ভারতে শাসন করেছিলেন বলেই আজ এ উপমহাদেশে প্রায় ৭০/৮০ কোটি মুসলমানদের বাস। যে ইসলামকে গ্রহণ করে নিজকে ধন্য মনে করি, সেই ইসলামের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা এ ক্রীতদাসদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। কারণ ইসলাম ইনসাফ এবং সাম্যের যে শিক্ষা দিয়েছে ইহা তারই প্রতিফলন। সাধারণ এবং সর্দার সকলেই যে ইসলামের বিধানে সমান এ মূল্যবোধটুকু প্রতিষ্ঠায় ইসলামের আবির্ভাব ইসলামী শাসনের সেই খেলাফত আমলে ঐ মৈত্রীর মূল্যায়ন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উহার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

হজরত ওমর (রাঃ) খেলাফত আমলের গাসসান গোত্রের সর্দার জাবালার কাবাগৃহ তওয়াফের সময় জনৈক গরীব মুসলমানের পায়ে জাবালার ইহরামের কাপড় জড়ায়ে পড়ে। ফলে জাবালা ক্রোধান্বিত হয়ে সজোরে ঐ ব্যক্তিকে থাপ্পর মেরে চার দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। গরীব মুসলমানটি হজরত ওমর (রাঃ)-র দরবারে বিচার দিলে খলিফা ওমর (রাঃ) জাবালাকে তলব করে। তখন জাবালা আসে এবং ঐ গ্রাম্য মুসলমানটিকে সামনে দাঁড়িয়ে দেখে ঘৃণাভরে বলে, 'ঐ গ্রাম্য একজন ক্ষুদ্র মানুষ আমার সামনে কি মর্যাদা পেতে পারে?' তখন হজরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ 'প্রথমত তুমি হারামশরীফেই এ দুর্ব্যবহার করেছো। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর কাছে তোমরা উভয়ই সমান। সুতরাং তুমি যা কিছু করেছ উহার শাস্তি বরণ করতেই হবে। কারণ ইসলামের বিচার হলো দাঁতের বিনিময়ে দাঁত। জাবালা বলল, 'যে ধর্মে বড় ছোটর কোন পার্থক্য নেই সেই ধর্মে আমি থাকতে চাই না।' তখন হজরত ওমর (রাঃ) জাবালাকে মুরতাদ বলে মৃত্যুদণ্ডের জন্য

www.amarboi.org

প্রস্তুত হতে বলে এবং একদিনের সময় দিয়ে তওবা করার পর জাবালাকে মুসলমান হয়ে দাঁত দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে। ঐ একদিনের অবকাশ পেয়ে জাবালা পালিয়ে রোমের সম্রাট কায়সারের নিকট চলে আসে। সাম্যের ও ইনসাফের এহেন শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা আজ বড় ছোট বিচারে মানবতার মূল্যায়ন করতে পারছে কি? রসূল (সাঃ)-এর নাম শুনলে তার উপর দরুদ ও সালাম পড়া হয়, তাঁর নাম শুনলে নামের উপর ফু দিয়ে চোখে লাগানো হয়। অথচ নবী (সাঃ)-এর সুন্নাতে যে মানবিক মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠা ছিল উহা কি মুসলমানদের জীবনে বাস্তবায়িত হতে পারছে? মনিব হবার কৌলিন্যের কারণে আমরা অনেক মনিবরাই নিম্নদের কৌলিন্যকে স্বীকার করি না। তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন নফর অর্থ ও তাকওয়া দিয়ে কৌলিন্য অর্জনে সক্ষম হলেও কৌলিন্যহারা মনিবরা তা স্বীকার করতে চায় না। বিষয় ভিত্তিক ইতপূর্বেকার আলোচনা থেকে পাঠকরা হয়তোবা বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষের অধিকার সংক্রান্তে ইসলামের বিধান কত ব্যপক বিবেচনায় রেখেছে। ঐ আধ্যাতিক এবং অর্থবোধক আয়াত ব্যতিত মানব অধিকার (Human Right) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে না।

শেষ কথা

আল কোরানে আল্লাহ বলেন–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط

অর্থঃ 'তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যে তোমাদিগকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' (সূরা মূলক ২)।

ঐ আয়াতের ব্যাপক বিবেচনায় যে এবাদত উহার সমস্তটাই মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত এবং সর্বোপরি ঈমান ও জেহাদ সমস্তটাই সমাজের অবহেলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। ঈমানের দাবীই হচ্ছে আমলে ছলেহার যেটা কোন অবস্থায়ই সমমানের মানুষের মধ্যে বিবেচনা

www.amarboi.org

করা হয় না। একজন রাজার সাথে আর একজন সমমানের রাজার; একজন ধনী লোকের সাথে সমমানের একজন ধনী লোকের আমলে ছলেহার আমল ততটা বিবেচ্য নয়; যতটা রাজার সাথে প্রজার এবং ধনীর সাথে গরীবের ছলেহার আমল মূল্যায়ন হয়ে থাকে। ধনী গরীবের কাছে তার জ্ঞানবুদ্ধি এবং অর্থ দিয়ে তার গরীব ভাইকে অবহেলিত অবস্থা থেকে অবস্থাপন্ন স্থানে তুলে আনবে এবং রাজা তার প্রজার কল্যানে রাজ্য শাসন করবে এটাই মূলতঃ ঈমানের দাবী। এর বিপরীত ব্যবস্থায় রাজা কর্তৃক প্রজার প্রতি অবিচার এবং ধনী কর্তৃক গরীবের প্রতি জুলম এটা কোন অবস্থায়ই ঈমানদার রাজা বা ধনীর পক্ষে ঈমানের দাবীতে শোভনীয় হতে পারে না। বরং তারাই জাহান্নামী। কারণ সামগ্রিকভাবে মানুষকে আশ্রাফুল মখলুকাত করা হয়েছে। কেননা মানুষ যে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি যারা আল্লাহর প্রতিনিধি সেই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্যের বিবেচনাহীন পার্থক্যবোধ প্রাধান্য পাবে তা আল্লাহর কাম্য হতে পারে না। তাই আল্লাহ তাঁর প্রতি ঈমানের পরে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও জেহাদ দিয়ে মানুষকে সাম্যের ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করার বিধি ব্যবস্থা দিয়েছেন। ঐ সত্যটি যারা উপেক্ষা করবে তাদেরকে বিচার করার একটি ব্যবস্থা হলো মৃত্যু নামক বিধানের। আমলে ছলেহার বিপরীত যে যুলুম, অত্যাচার ও অবক্ষয় উহার তাৎক্ষণিক বিচার যদি আল্লাহ করতেন; তাহলে মানবগোষ্ঠীর মৃত্যু হতো না সত্য, কিন্তু একাধিক অন্য শাস্তির কারণ মানবগোষ্ঠী যে বিপাকে পড়তো, তাতে কি মানুষের পক্ষে আশ্রাফুল মখলুকাত হওয়া সম্ভব হতো? মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার বিকাশে স্থবিরতা এসে যেত। অথবা স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার বিকাশে মানুষের পদস্খলনের প্রয়াসে যে পুঞ্জিভূত পাপ সে করে বসত, উহার বিচারে আল্লাহ যদি প্রাকৃতিক বিধানের আলো বাতাসের অভাব; আগুন পানির কার্যকরণ; অনাহার; অনটন; রোগ শোক; অতিবৃষ্টি ইত্যাদি দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষকে পৃথিবীতেই বিচার ও শাস্তির বিধান রেখে দিতেন, তবে কোন অবস্থায় মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকতো না এবং সেখানে সত্য ও মিথ্যা পরীক্ষা থাকতো কি? অথচ আল্লাহর প্রতি ঈমানের ব্যাপারটি মূলতঃ পরীক্ষাভিত্তিক। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

অর্থঃ 'লোকেরা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?' (আনকাবুত ২)

www.amarboi.org

সুতরাং আল্লাহর আয়াতগুলোর মধ্যে যে ছলেহার অর্থাৎ সৎ কাজের নির্দেশ উহার আমলের সাথে পরীক্ষার প্রশ্নটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও জেহাদের মধ্যে যে সাম্যের ও মৈত্রীর আমল সেখানে উঁচু-নীচুর, ছোট-বড়র, মালিক-ভৃত্যের, ধনী-গরীবের, জোলা-অজোলার, সাদা-কালোর, বিবেচনা করার অবকাশ কোথায়? যদি বিবেকের বিবেচনা করাই হয়; তবে ঈমানের দাবীর কারণে যে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও জেহাদের নির্দেশ উহা অবশ্যই উপেক্ষিত হয়ে মানুষকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হবে। ঐ পরীক্ষার ব্যর্থতা উভয় জগতের জন্যই আজাবজনিত। একটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে একটি নেতা সামাজিকভাবে, এবং একটি দেশ আন্তর্জাতিকভাবে অন্য একটি মানুষ সমাজ এবং দেশের লোকদের ছোট ও অবহেলা করে সে কি স্রষ্টার সৃষ্টির একটি সত্যকে অহেতুকভাবে গোপন করছে না? ঐ সত্যকে সামগ্রিকভাবে গোপন করছি বলেই আমরা সকলেই উচু-নিচুর, সাদা-কালোর, মনিব-ভৃত্যের মতভেদের সংঘাতে মরছি। অথচ তাকওয়া পরহেজগারীর মানদন্ডই একটি মানুষ থেকে আর একটি মানুষের একটি দেশ থেকে আর একটি দেশের মানুষের পার্থক্য বিবেচনা করার অবকাশ দেয়। আল্লাহর মনোনীত ধর্মের এই বাস্তব সত্যকে আমরা অনেকেই গোপন করছি। অথচ আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ -

অর্থঃ 'যার কাছে আল্লাহর তরফ থেকে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে সে যদি উহা গোপন রাখে তবে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? (সূরা বাকারা ১৪০)

কোন মানুষ গরীব অথবা কালো, অথবা ছোট কাজ করে বলে তাকে অবহেলা করে তার সাথে ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ করার যে অবকাশ নেই ঐ সত্যটুকু হুজুর (সাঃ) তার জীবনে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে গেছেন। আল্লাহর ঐ বিধান পৃথিবীতে হুজুর (সাঃ) বাস্তবায়িত করে দেখেছেন কি দেখান নি এর জন্য সত্য সাক্ষী আল্লাহর রসূল (সাঃ) এবং আমরা ঈমানদার। এ ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালা আল-কোরাণ বলেন-

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

www.amarboi.org

অর্থঃ "যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্যে সাক্ষী হও, আর রসূল (সাঃ) যেন সাক্ষী হয় তোমাদের উপর"। (সূরা বাকারা-১৪৩)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমরা রসূল (সাঃ)-এর অনুসারী কেউই কি আমার আলোচিত সত্যের জন্য সত্য সাক্ষী দিতে পারবো? রসূল (সাঃ) মানবতার মর্যাদার জন্য যে শিক্ষা ও আদর্শ রেখে গেছেন আমরা মুসলমানরা উহা কি গোপন করছি না? মানব মূল্যায়নের যাবতীয় সত্যকে গোপন করছি বলেই আজকে পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা কমে এসে এক পঞ্চমাংশে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমরা ঈমানদাররা জানি পৃথিবীতে আর নবী আসবে না। এ বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তবে কি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট আছি? আমাদের ব্যর্থতার কারণে বাকি চতুর্থাংশ যদি জাহান্নামী হয়, তবে কি সেই পরকালের বিচারে আমরা জান্নাতের আশা করতে পারবো? মনে রাখতে হবে মুসলমান আল্লাহ ও রসূলের প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে বাস করে এবং কাজ করে। মূলতঃ উহা আল্লাহর দ্বীনের সত্যকে জাগ্রত রাখার জন্য। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ-

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ -

অর্থঃ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সকল প্রাণী নিয়ে তার পরিবার। তিনিই আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়, যিনি আল্লাহর সৃষ্টি প্রাণীগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করেন।'

হুজুর (সাঃ) এও বলেছেন, 'তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে কি ভালবাস? তাহলে প্রথমে তোমার স্বগোত্রদেরকে ভালবাসবে।'

কিন্তু কোরান ও হাদিসের সত্যের সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে না পেরে অন্য প্রাণী তো দূরের কথা নিজের সগোত্রীয়দেরও ভালবাসতে পারছি কি? একই মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে; একই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে মুসলমান নামের লোকদের যদি জোলা-অজোলা, সাদা-কালো, চাকর-মনিব এবং আরব-অনারবের পার্থক্যকে বিবেচনা করতে হয়; তবে জাতের ও মতের ঐ বিবেচনা আল্লাহর আশরাফুল মখলুকাত তাঁর (আল্লাহর) প্রতিনিধিত্বে পরাকাষ্ঠা অর্জন করতে পারবে কি? আশরাফুল মখলুকাত যদি তার আশরাফী অর্জনে ব্যর্থ হয় তবে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভেদ, ব্যাকুলতা ও বিড়ম্বনায় ভরে উঠবে। আজকের বিশ্ব

www.amarboi.org

ঐ ব্যাকুল, বিভেদ ও বিড়ম্বনার ভারসাম্যহীন সমাজের একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। Balance of power-এর যে পরাশক্তি তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় আজকের রাষ্ট্রপুঞ্জ (U.N,O) গোষ্ঠিমালিকানায় পর্যবসিত হবার কারণে ভারসাম্যহীন পৃথিবীতে শোষণ ও জুলমের জয়যাত্রা দেখতে পাচ্ছি।

আমি যখন আমার এ বইটি লেখার শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছি, তখনই শুরু হতে দেখলাম বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অমানবিক আচরণে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল। আর এটা সম্ভব হয়েছিল পরাশক্তির গোষ্ঠিমালিকানার জাতিপুঞ্জের দ্বারা এবং এই কারণে যে কুয়েত ও ইরাক উভয়ই মুসলমানদের দেশ। মুসলমান কোরান ও হাদিসের মতাদর্শকে ভুলে গিয়ে তারা আরব জাতীয়তায় স্বার্থান্ধ। তাই তাদেরকেই ইরাক রাত্রের অন্ধকারে তার সগোত্রীয় কুয়েতী ভাইদের যে মর্মান্তিকভাবে হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ ইত্যাদি করে তাদের মাতৃভূমি দখল করে নিলো উহার ইতিহাস ইতিকথায় ঈমান ও আল্লাহকেই কটাক্ষ করছে। ১৯৯০ সালের ২রা আগস্ট সেই হীন দেশ দখলের দিন। একটি মুসলিম দেশ আর একটি শরীয়তসম্মত মুসলিম দেশকে আক্রমণ ও দখল করে নেবে এটাতো ইসলামের ইতিহাসে নেই। ইরাক এহেন কাজ দ্বারা সে কি আদৌ মানব মূল্যায়নের সামান্যতম মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছে? তার এহেন হীন কাজ দ্বারা সে শুধু তার আরব ভাইদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করলো না; বরং ইসলামী উম্মাহর দায়িত্বে যে ওহীর নির্দেশ ছিল উহা থেকেও সরে দাড়ালো। আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

অর্থঃ এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।' (আল ইমরান ১১০)

মুসলিম উম্মাহর জন্য এখন আর ঐ কাজ ততটা সহজ হবে না। অধিকন্তু ইরাক ইসলামের শত্রুদেরকে এমন সুযোগ করে দিল যাতে বাকি মুসলিম উম্মাও তাদের ঐ দায়িত্ব পালনে শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে। তাই বিশ্বের অমুসলিম সমাজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন খোদ মক্কা ও মদিনার মাটিতে। মুসলমানদের জন্য এর থেকে লজ্জার এবং অপমানজনক অবস্থা আর কি হতে

www.amarboi.org

পারে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু পরাশক্তিধরদের কাছে ইরাকের মুসলমানদের অপমানজনক চুক্তিতে আবদ্ধ করে নিচ্ছে যাতে মুসলমানরা কোনদিন মাথা জাগাতে না পারে। আর এগুলোর সমস্তটাই সম্ভব হচ্ছে মানব মূল্যায়নের অভাবে যা কোরান হাদিস সংক্রান্ত অজ্ঞতারই কারণ। কেননা কোরানের সামগ্রিক উপদেশ এবং হুজুর (সাঃ)-এর বাস্তব জীবন মানব মূল্যায়নের যে শিক্ষা রেখে গেছেন উহা অধিকাংশ মুসলমানদের জীবনে তাদের ঈমানের সহায়ক শিক্ষা হিসেবে আজও স্বীকৃতি পায়নি। প্রতিটি মুসলিম দেশ কোন না কোন পরাশক্তির পরামর্শের মুখাপেক্ষী হয়ে তারা পরস্পরে আত্মকলহে ভাই ভাইয়ের রক্ত ঝরাচ্ছে। কারণ তারা কোরানের নির্দেশ ও উপদেশ মানছে না। আল্লাহ আদেশ দিয়ে বলছেন-

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط
اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

অর্থঃ যেসব মুনাফিক ঈমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফের লোকদের নিজেদের বন্ধু ও সংগীরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। ইহারা কি সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের নিকট যায়? অথচ সম্মানতো সমস্তই একমাত্র আল্লাহর জন্য (নিসা ১৩৮-১৩৯)

ঐ একই সূরার ১৪৪ আয়াতেও আল্লাহ বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

অর্থঃ 'ঈমানদারগণ! ঈমানদার লোকদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলে দিতে চাও?' (নিসা ১৪৪)

সূরা আল ইমরানে আল্লাহ বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى
اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ *

www.amarboi.org

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি সেই সব লোকের ইশারা অনুযায়ী চলতে শুরু কর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করছে তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হবে।' (আল ইমরান ১৪৯)

মুসলমানদের সামনে ঐ সকল নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা পরাশক্তিধর অমুসলিমদের বন্ধু বিবেচনায় তাদেরই পরামর্শে ও তাদেরই অস্ত্র দিয়ে এক ভাই অন্য ভাইয়ের রক্তের বন্যা বহাচ্ছে। যারা মানুষের মর্যাদার প্রশিক্ষণ দেবে তারাই আজ মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। কারণ তারা আজ কোরান থেকে শিক্ষা বা উপদেশ নিতে পারছে না। অথচ আল্লাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ *

অর্থঃ আমরা এ কোরানকে উপদেশ লাভের জন্য সহজতম উপায় ও মাধ্যম বানিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণ করবার কেহ আছে কি? (কামার ৩২)। কোরান মানবতার অন্তরায় নয়; বরং কোরানের আবির্ভাব মানবতার মর্যাদা ও মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য। আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ বা নিষেধ নয় বরং প্রতিষ্ঠাকারকের জীবনের আমলই বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠাকরণ বিধান।

ইতপূর্বেকার আমার ব্যাপক আলোচনায় সত্যের সমর্থনে আমি বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম যাতে আমার মানব মূল্যায়নের বিবেচনায় বিশেষ শক্তি যোগায়।

পবিত্র মহান হজ্জের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফায় শুভাগমন করলেন এবং সেখানে অবস্থান করলেন। পরে যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তে লাগল, তখন তিনি স্বীয় বাহন কাসওয়াকে আনবার জন্য হুকুম দিলেন। উট্নীকে প্রস্তুত করে পেশ করা হলো। তিনি সওয়ার হলেন এবং সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভাষণ দান করলেন, যাতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বর্ণনা করেছেন।

তিনি আল্লাহ্ তায়ালার হাম্দ ও সানা বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বীয় ভাষণ এভাবে শুরু করলেনঃ

www.amarboi.org

আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক। কেহই তাঁর সমকক্ষ নয়। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর একক সত্তাই বাতিলের সামগ্রিক শক্তিকে পরাভূত করলেন।

ওহে মানবমন্ডলী। তোমরা আমার কথা শোন। আমি জানিনা যে ইহার পরে আবারও আমরা এভাবে কোনও সমাবেশে একত্রে মিলিত হতে পারব কি না। (হয়ত এবারে এই হজ্জের পরে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে পারব না)।

হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন যে- হে মানবজাতি, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে পয়দা কবেছি এবং তোমাদেরকে সমাজ ও গোত্রে ভাগ করে দিয়েছি যেন তোমরা পৃথকভাবে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে চলে এবং তাঁর কথা বেশী স্মরণ রাখে। সুতরাং কোন আরববাসী অন্য কোনও অনারব বা আজমী লোকদের তুলনায় কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নহে। পক্ষান্তরে কোনও অনারব বা আজমী ব্যক্তিও তদ্রুপ আরববাসী কোনও লোকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে। তদ্রুপ শ্বেতকায় কোন ব্যক্তি কৃষ্ণকায় লোকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে। হাঁ, মর্যাদা ও সম্মানের যদি ও কোন মাপকাঠি থাকে তবে উহা একমাত্র তাক্ওয়া বা পরহেজগারী।

সমগ্র মানবজাতি এক আদমেরই সন্তান এবং আদমের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই যে তাঁকে মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এক্ষণে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সকল দাবী রক্ত ও বিত্ত-সম্পদের সকল দাবী ও সকল প্রতিশোধ আমার পায়ের নীচে পদদলিত হল। আল্লাহর ঘরের হেফাজত, সংরক্ষণ ও হাজীগণের জন্য পানি পান করানোর ব্যবস্থা পূর্ববৎ বহাল থাকবে।

অতঃপর তিনি আরও ইরশাদ করলেনঃ

হে কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকগণ! তোমরা দুনিয়ার বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হইও না, আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না।

হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মিথ্যা অহংকার-অহমিকা নির্মূল করে দিলেন। এক্ষণে বাপদাদার কীর্তি-কাহিনী নিয়ে গর্ব অহংকারের কোন অবকাশ রইল না।

www.amarboi.org

হে মানবমন্ডলী! তোমাদের রক্ত, বিত্ত, সম্পদ ও ইজ্জত পরস্পরের জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম করে দেওয়া হল; যেমন আজকের এই দিনটি, এই পবিত্র মাসটি, তোমাদের এই শহর সকলের জন্য হারাম।

তোমরা সকলেই আল্লাহর দরবারে হাজির হবে এবং তিনি তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। মনে রেখ, আমি তোমাদেরকে যা করার সবকিছু বলে গিয়েছি। খবরদার, আমার পরে যে পথভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর মারামারি ও হানাহানি আরম্ভ করে না দাও। যদি কাহারও নিকট আমানত রাখা হয় তবে সেই আমানতী জিনিস যে ব্যক্তি আমানত রাখল তার নিকটে পৌছাইয়ে দেয়া তারই কর্তব্য।

হে লোক সকল! প্রত্যেকটি মুসলিম অপর একজন মুসলমানের ভাই। নিজের দাস-দাসী সম্পর্কে তোমরা খেয়াল রাখবে। তাদেরকে তাই খেতে দাও যা কিছু তোমরা আহার করবে, তোমরা যে ধরনের জামাকাপড় পরিধান করবে তেমন জামাকাপড়ই তাদেরকে পরিধান করাতে হবে।

তোমরা শুনে রাখ, অন্ধকার জাহেলিয়াত যুগের সকল নাম-নিশানা আমি আমার পদতলে নিষ্পিষ্ট করে ফেললাম। জাহেলিয়াত যুগের রক্তের সকল প্রতিশোধ দাবী রহিত করা হল। প্রতিশোধের প্রথম দাবী যা বাতিল করলাম ইহা আমার নিজ বংশের দাবী। রাবিয়া বিন আলহারিছের দুগ্ধপোষ্য শিশুর রক্তের প্রতিশোধ দাবী- যে শিশুকে বনু হুজায়লারা হত্যা করেছিল। আজ আমি উহা মাফ করলাম। জাহেলিয়াত যুগের সুদ এক্ষণে আর কোনও মূল্য রাখে না। সর্বপ্রথমে আমি যে সুদ বাতিল করলাম উহা আব্বাছ বিন আবদুল মুত্তালিব বংশের প্রাপ্য সুদ আজ হতে উহা খতম হয়ে গেল।

হে মানবমণ্ডলী! মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি হকদারকে তার ন্যায্য অংশ বা অধিকার নিজেই দান করেছেন। এখন হতে কোনও ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীর জন্য অছিয়ত প্রযোজ্য নহে।

সন্তান তারই নামে পরিচিত হবে যার শয্যায় সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যার উপরে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হবে তার শাস্তি প্রস্তরখণ্ড। তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর দরবারেই হবে।

যে কেহ নিজ বংশ পরিচয় বদল করে কিংবা কোনও গোলাম যদি নিজ মনিবের বদলে অপর কাহাকেও মনিবরূপে পরিচয় দেয় তবে তার উপরে আল্লাহর অভিসম্পাত।

www.amarboi.org

কর্য অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। ধার হিসেবে গৃহীত জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া আবশ্যক। উপহারের বিনিময়ে দান করা দরকার।

তোমরা নিজেদের উপরে জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হইও না।

কোনও ভাইয়ের সন্তুষ্টি ব্যতীত তার নিকট হতে জিনিস গ্রহণ করা জায়েজ নহে। তবে সন্তুষ্টচিত্তে যদি কিছু দান করে সে কথা আলাদা। তোমরা নিজেদের উপরে জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হইও না।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার কোনও জিনিস অন্য কাহাকেও দেওয়া জায়েজ নহে।

হে বিশ্ববাসী! দেখ তোমাদের উপরে তোমাদের স্ত্রীদের কিছু হক বা অধিকার রয়েছে। তাদের উপরেও তোমাদের সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার হল, এমন কোনও লোককে কাছে না ডাকে যাকে পছন্দ কর না। আর তোমাদের উপরে তাদের হক হল যেন কোনও প্রকার খেয়ানত না করে, কোনও প্রকার বেহায়াপনায় লিপ্ত না হয়। কিন্তু সে যদি তেমন কিছু করে বসে তবে আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে তোমরা তাদেরকে মামুলী ধরনের দৈহিক শাস্তি দাও। ফলে তারা যদি বিরত হয় তবে তাদিগকে উত্তমরূপে খোরপোষ দিতে থাক।

স্ত্রীদের সহিত তোমরা সদ্ব্যবহার কর। কারণ তারা যে তোমাদেরই অনুগত। নিজেদের জন্য তারা কিছুই করতে পারে না। সুতরাং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ রাখবে। কারণ আল্লাহর নামেই যে তাদিগকে তোমরা হাসিল করেছ এবং তাঁর নামেই তোমাদের জন্য তারা হালালরূপে গণ্য হয়েছে। সুতরাং তাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে তোমরা আমার নছিহত গ্রহণ কর।

আমি তোমাদের মধ্যে এমনই দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যেন তোমরা গোমরাহ না হও। অবশ্য যদি তোমরা উহার উপরে কায়েম থাক। উহা আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত। খবরদার, দেখ তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। কারণ তোমাদের পূর্বেও লোকজন এই সকল কারণেই ধ্বংস হয়েছে।

এক্ষণে আর শয়তানের জন্য এমন কোন আশা রইল না যে এই নগরীতে উহা ইবাদত করা হবে। তবে এমন আশংকা রয়েছে যে সকল বিষয়ে তোমরা তেমন কোনও গুরুত্ব দাও না, কেবল সে ক্ষেত্রেই উহার কথা মান্য করা হবে।

www.amarboi.org

সে ইহাতেও সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং উহার কবল হতে তোমরা নিজেদের ঈমানের হেফাজত কর।

হে মানবমন্ডলী! তোমরা নিজেদের পালনকর্তার ইবাদত কর। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় কর, একটি মাস রোজা রাখ। নিজেদের ধন সম্পদের যাকাত সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় করতে থাক। নিজেদের রবের ঘর বায়তুল্লায় হজ্জ কর এবং নিজেদের ব্যবস্থাপকগণের কথা মান্য কর, তবেই তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।

প্রত্যেক অপরাধী ব্যক্তি নিজ অপরাধের জন্যই দায়ী হবে। পিতার বদলে পুত্রকে পাকড়াও করা হবে না, কিংবা পুত্রের জন্য পিতাকে দায়ী করা হবে না।

শোন! এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের কর্তব্য এই নির্দেশ ও বাণীসমূহ তাদেরকে পৌঁছে দেয়া, যারা এখানে উপস্থিত নেই। হয়ত অনুপস্থিত লোকদের মধ্যেই কেহ তোমাদের তুলনায় ইহা উত্তমরূপে বুঝবে এবং বেশী সংরক্ষণ করবে।

হে প্রিয় লোক সকল! তোমাদিগকে আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, বল, তোমরা আমার সম্পর্কে কি উত্তর দিবে?

সমবেত জনতা উত্তর দিলঃ আমরা ইহার সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আমানত পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি রিসালতের হক আদায় করেছেন এবং আমাদের মঙ্গল করেছেন।

ইহা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় শাহাদাত অঙ্গুলী আসমানের দিকে তুললেন এবং লোকজনের দিকে ইশারা করলেনঃ ইয়া আল্লাহ, তুমি সাক্ষী হও। ইয়া আল্লাহ, তুমি সাক্ষী হও। ইয়া আল্লাহ, তুমি সাক্ষী হও।

রসূল (সাঃ)-এর এ বাণীর যদি আমরা সাক্ষী হতে পারি তবে মানব মূল্যায়নের জন্য যে দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হবে উহাই 'আমলে ছলেহা' আমলে মানুষ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে পারবে। মনে রাখতে হবে 'আমলে ছলেহা' অর্থ্যা সৎ কজ সংক্রান্তে আল্লাহ ও রসুল (ছঃ) এর বাণী মানুষের অধিকার প্রতিষ্টার একমাত্র ইসলামী বিধান। প্রতি যুগে যুগে মানবাধীকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নবীদের আগমন হয়েছিল এবং প্রত্যেক নবীই

www.amarboi.org

ইসলামের আইন বা বিধান দিয়েই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে গেছেন। উহা প্রমানের জন্য আল-কোরাণের আয়াত এবং রসুল (ছঃ) এর বাণীর বিপরীত কোন ব্যবস্থা মানুষ দিতে পারে নাই। সুতরাং মানবাধীকার প্রতিষ্ঠায় (Human Right) ইসলামের অমীয় বাণীকে অবহেলা করে যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠীত হতে পারে না উহা পূর্বালোচিত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের হরিজন প্রসংগের উদ্ধৃত তথ্য থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে। আসুন ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা করি। তাতেই মানবধীকার প্রতিষ্ঠিত হবে- অন্যথায় নয়।

পাশ্চাত্যের মারণস্ত্রধারী পরাশক্তিধরদের মানবাধীকারের Slogan সফলতা আনতে সক্ষম হচ্ছেনা একারণে যে উহাতে মানুষের অধিকার অস্ত্রের মুখে অবহেলিত হচ্ছে। কারণ ঐ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আবেদনকারীর আত্মায় আধ্যাত্মিকতার আবেগ থাকে না। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ধারনার মানবাধীকার সংক্রান্তে সত্যাধিক বিভ্রান্ত এটাই প্রমান করে যে ঐগুলো মূলতঃ অধিকারের প্রশ্নেব এবং ব্যবসাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পর্য্যাবশিত হয়েছে। এবং এ কারণেই পৃথিবীময় অধিকারেরর সংঘাতে অনেক অনেক অশান্তিতে আজ বিশ্ব বিষময় হয়ে উঠেছে। কারণ মারণাস্ত্র মানুষের বাচার অধিকার দিতে পারে না। বরং ইসলামের মৌলিক এবাদতের নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের বিধানই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণ। যাহা মূলতঃ প্রকাশ পায় এ এবাদত থেকে আসা আমলে ছলেহার বহিঃপ্রকাশে। মানুষ যিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর থেকে নেয়া বিধান দিয়েই মানুষের অধিকার (Human Right) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

শেষ কথার শেষাংশে এসে বিগত ২৬-১১-৯৭ ইং তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি সেমিনারে উপস্থিত হলাম। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল Refuzees : Human Rights have no border আয়োজনটি ছিল Amensty International-এর বাংলাদেশীয় কর্তৃপক্ষের। কিন্তু যারা যেভাবে এহেন মানবাধিকার আন্দোলন করছেন তারা বিষয়টি বেশীর ভাগই রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী থেকে বিবেচনা এবং সমাধানের পথে আগাতে চান। আসলে মানব যিনি সৃষ্টি করলেন—মানবে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াশ তারই দেয়া বিধান থেকে নিতে হবে। লক্ষ লক্ষ নবী-রসূলদের আগমন তো মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াশেই ছিল। অথচ মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে এক ধরনের বস্তুবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব

www.amarboi.org

ব্যক্তি খায়েস চরিতার্থের কারণে পৃথিবীকে অসংখ্য ভাগে ভাগ করে উপনিবেশীক ঔদ্ধ্যত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ভৌগলিক সীমানার যে সকল রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে তাতে মৌলিক অধিকারগুলো সীমানা (Border) দিয়ে চিহ্নিত করণ করা হয়েছে। যে মৌলিক অধিকার দিয়ে মানুষকে ইরানে সাজানো হয়েছে, তা ভারতে বা রাশিয়াতে পাওয়া যাবে না। আবার সেখানে যে মৌলিক অধিকারে মানুষের জীবনের সুখের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তা উগাণ্ডা, আলজিরীয়াতে পাওয়া যাবে না। কারণ তারা স্ব স্ব সীমানায় মানুষের মৌলিক অধিকারের আঞ্চলিক সীমানা টেনে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ তো মানুষকে সমস্ত পৃথিবীর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন।

মানুষ যখনই যে দেশে তার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াশ নিয়েছে তখনই ধর্ম বিবর্জীত বস্তুবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঐ মানুষগুলোকে অত্যাচারের মাধ্যমে ঠেলে দিয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। ভিটেছাড়া ঐ মানব গোষ্ঠী পররাষ্ট্রের সীমানায় মহাজের (Refuzee) নামে আখ্যায়িত হয়ে যে অমানবিক কষ্টের স্বীকার হয়, উহাকে আল্লাহ প্রদত্ত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না করে নেহায়েত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করা হচ্ছে। আল্লাহর আদালতে মানবাধীকার (Human Rights) এবং মহাজেরের অধিকার (Refuzee Right)-কে আলাদা করে দেখার বিবেচনা নেই।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এহেন মানবাধিকার আন্দোলন প্রসংগে নোভেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসার মুমতাজ সোয়েল সাহেব বলেছেন ঃ

"Human Rights are being used as a Weopon in International Politics.

যে পরাশক্তিরা তাদের উপনেবেশিক স্বার্থে মানুষের মৌলিক অধিকারকে অজাচিতভাবে অমর্যাদা করছে তারাই রাজনৈতিক স্বার্থে দেশ বিশেষের প্রতি মানবাধিকারের নিত্য নতুন সংজ্ঞায় সোচ্চার। তারাই সীমানা দিয়ে Refuzee নামের আখ্যা নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমানার পার্শ্বে Camp বা তাবু বসিয়ে অবহেলিত মানুষদের খাদ্য ও বস্ত্রের Relief খাওয়াচ্ছে। অথচ ঐ Refazee বা তাদের নিজেদের দেশে ঐ মৌলিক অধিকারের আন্দোলন করেই এহেন নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে। তাই জর্জ বার্কলের ভাষায় বলতে হয় ঃ

"আমরা আগে রাস্তায় ধূলো উড়িয়ে অন্ধকার করেছি পরে দেখতে না পেয়ে নালিশ করছি।"

www.amarboi.org

Human Rights have no border এহেন আলোচনার বিষয় তো আয়াতের সত্যতাকে প্রমাণ করে। কারণ ঐ আয়াতের আলোচনায় মানুষের অধিকার সংক্রান্তের বিষয়গুলোকে কোন ভৌগলিক সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়নি। পৃথিবীর সমস্ত মানুষতো একই মৌলিক অধিকারের অধিকরণ নিয়ে বাঁচতে চায়। তাই যদি সত্যি হয়, তবে কোন যুক্তি দিয়ে এবং কাদের স্বার্থে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রের সীমানা টেনে মানুষের অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। যে সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থনৈতিক কারণে এবং জাতের বিচারে উপনেবেশিক দৃষ্টিকোণে Border দিয়ে Human Rights-কে প্রতিষ্ঠার প্রয়াশ নিতে চান তারা যেমন বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন, তেমনি তারাও বিভ্রান্তির মধ্যে যারা অধিকারের আন্দোলনকে অজাচিতভাবে অত্যাচারের মাধ্যমে নিজ দেশের মানুষকে পার্শবর্তী রাষ্ট্রে ঠেলে দিয়ে Refuzee আখ্যায়নে তাদেরকে অমানুষিক কষ্টে ফেলেছেন।

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ যখন একাধিক নয়, তখন তার সৃষ্ট প্রতিনিধি বা খলীফাদেরকে একাধিক ধর্ম এবং মৌলিক অধিকারের বিকল্প কিছু দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেবেন উহা বিবেচ্য বিষয় নয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিবেচনা একটি ধর্মীয় বিবেচনা যার সত্যতা এবং পূর্ণতার স্বীকৃতি পেয়েছে। ইসলামের আল কুরআনে এবং কুরআন পূর্ব সমস্ত ওহীকৃত কেতাবে। অথচ ওহিকৃত নৈতিক নির্দেশকে অমান্য করে নেহায়েত অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তি রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে বর্তমানে পৃথিবীতে ২৫ থেকে ৩০ কোটি মানুষ Refuzee হিসেবে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে খোলা আকাশের নীচে মানবাতর জীবনযাপন করছেন। (Refuzee Ibid-P-42) পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই ধর্মীয় এবং জাতীয় কোন্দলের কারণে মানুষের অধিকারকে নির্বাসন করা হচ্ছে এবং একটি সীমানা দিয়ে অধিকারের অপরিহার্য বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। অথচ Refuzee Rights এবং Human Rights-এর মধ্যে পার্থক্যকরণ অর্থ মানবাধিকারকে খাটো করে দেখা। এ ব্যাপারে পূর্বালোচিত সেমিনারের প্রবন্ধ পাঠক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মাইয়নুল আহছান খান তার লিখিত Human Rights have no border নামক প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

"Like human right the refuzee right an also of universal character. To take asylum in any foriegne country is a direct and immdiate methed of human rights protection. When all other forms of safegurd fail, asylum become an importent preventive

www.amarboi.org

human right for existen." "The right to protection from refoulment that refuzee have international refuzee law is simely another means by which basic human rights are safe guarded. The linkage between refuzee right and human rights can be seen on the fundamental principle of non foulment." (Ibid, p-29). Usually refuzees flee from their homeland to foreign country. Internally displaced people also may suffer all form of cousalities of uprooted people. But in the eye of law, internally uprooted people do not enjoy the status of refuzees. Human rights are to be protected for them.

During the years of 1991-1995, ethni cleansing was so apparent in Bosonia that the whole world was caught by surprise. As if Bosonia is not situated in Europe and European Nations did not have the political will to do somthing substantial for the Bosonia Muslims. Not only that all the borders of the neighbouring countris were sealed so that no Bosonia citizen could flee from Bosonia."

সীমানার ভীতরে এবং সীমানার বাইরে মানবাধীকার কিভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে উদ্ধৃত তথ্য তা প্রমাণ করে। অথচ ইসলামের নবী (সা) কিভাবে Refuzee সমস্যার সমাধান দিয়েছেন উহার প্রমাণ রয়েছে হুজুর (সা) মদীনায় হিজরতকালীন সময়ের মধ্যে। মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম শুধু খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং বাসস্থানের অধিকারেরই কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, অধিকন্তু মৌলিক অধিকারের অন্যতম যৌনাধিকারকে মানবিক দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করে যে বিবাহের ব্যবস্থার বিধান দিয়েছে তা কি মানবিক নয় ? অনৈইসলামিক সমাজে Boy Friend এবং Girl Friend নামে যে যৌনাচার এবং নারী নির্যাতন এটা কি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আদৌ কোন প্রয়াশ ? ইসলাম পর্দার বিধি-বিধান জারী করে নারী-পুরুষদের যৌনাধিকারকে যে মানবিক মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠা করেছে উহাতে নির্যাতনের প্রয়াশ কোথায় ? Free Sex-এর সমাজে যে যৌনাচার এর প্রভাবে সে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য এমন কি আইন আদালতের বিচারও যে যৌনাচার সমর্থিত রায় আসতে পারে এর প্রমাণ Fanny Hill নামক অশ্লীল উপন্যাসের প্রকাশের অনুমোদন। আমেরিকার সুপ্রিমকোর্টের আদালতে Fanny Hill নামক

www.amarboi.org

একটি অশ্লীল উপন্যাসের বিরুদ্ধে আনিত মামলার রায় আদালত সংবিধানিক অধিকারকে উদ্ধৃত দিয়ে যে রায় প্রকাশ করেছেন উহার কিছু Findings তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৬৬ সনের ২১শে মার্চ মাসে দেয়া সেই রায়তে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের বিচারকবৃন্দ বলেন, "যে বই সামাজিক মূল্য বহন করে সে বই বাজেয়াপ্ত করা উচিত নয়। পরীক্ষা করা প্রয়োজন তর্কিত বইয়ের সামাজিক মূল্য আছে কি না ? মূল্য যদি থাকে, তবে সে বই সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারের আশ্রয় পাবে, সে বইয়ের প্রকাশ বন্ধ করা যাবে না। ফ্যানি হিল-এর প্রকাশ প্রশ্নে আদালত দু'টি বৃহৎ নীতি একে অন্যের উপর প্রধান্যের দাবী করেছে। এ দু'টির একটি হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতাবাদ এবং অন্যটি শোভনতাবাদ। যারা স্বাধীনতাবাদী তারা বলেন যে, প্রকাশনার স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হওয়া উচিত। যে মুহূর্তে একটি রচনাকে অশ্লীলতার অভিযোগে স্তব্ধ করে দেয়া হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি সত্যের অপমৃত্যু ঘটে। গতকালের মানুষ যাকে অশ্লীল মনে করেছিল, আজ তা শিল্প সুষমায় সমৃদ্ধ।"

শোভনবাদীরা বলেন যে, প্রকাশের স্বাধীনতা লেখককে অশ্লীল হবার অধিকার দেয় না। মানুষের মনে সহজাত বৃত্তিরূপে কতিপয় আবেগ অবস্থান করে। তার মধ্যে কাম প্রধান এবং প্রবল। সভ্যতার জন্য এ বৃত্তি সংযত হওয়া প্রয়োজন। যে রচনা এ বৃত্তিকে সংযত না করে উদ্দাম করে দেয় উহা প্রকাশ যোগ্য নয়। শোভনবাদী মনোবিজ্ঞানী ডঃ জোসেফ এফ জিগারেলি সাহেবের আদালতে দেয়া জবানবন্দিকে উপেক্ষা করে আদালত প্রকাশের অনুকূলে রায় দিয়েছেন। আদালত কোন ব্যক্তির অধিকারকে সংরক্ষণ করতে গিয়ে সমাজের পাপাচারকে যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন উহার প্রভাব থেকে প্রাচ্যের অনুন্নত সমাজের মানুষেরা কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে উহার একটি তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে।

গত ১৪, ১৫, ১৬ই নভেম্বর/৯৭ ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় পতিতাদের এক সম্মেলন—উদ্যোগক্তরা যার নাম দিয়েছে "যৌনকর্মী সম্মেলন"। উহাতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজীত গুপ্ত প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থন এবং তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নারী দেহের ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত হবে। এতে ভবিষ্যতে প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ আশপাশের দেশ থেকে ভারতে নারী পাচার বৃদ্ধি পাবে। (দৈনিক সংগ্রাম ৯/১২/৯৭) উদ্ধৃত তথ্য থেকে পাঠকরা অনুমান করতে পারবেন

www.amarboi.org

যে, মানবাধিকারের নামে যৌনাচারের সীমা মানুষকে বিশেষ করে নারীদেরকে কত নীচে নামিয়ে দিয়েছে।

এহেন অশ্লীল যৌনাচারকে অধিকতর উপভোগ্য করার জন্য ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে দামী বিয়ার বা মদ "তুতেনখামেন এইল"। লণ্ডনের বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর "হ্যারডমে" এই দামী সুরা বিক্রি হয়। প্রতিটি বোতলের জন্য ক্রেতাদেরকে প্রথমদিকে দাম দিতে হয়েছে ৭ হাজার ৬ শত ৮৬ ডলার। বিয়ার উৎপাদনকারী নিউক্যাসল ব্রুয়ারিজের বাণিজ্যিক পরিচালক জিমে মেরিংটন এক সাক্ষাতকারে বলেন যে, এ বিয়ার বানাতে গিয়ে তাদেরকে ঝাড়া ৫ বছর খাটাখাটি করতে হয়েছে। তার মতে তুতেনখামেন এইল মিশরের ফারাওদের তরল স্বর্ণ। এ বিয়ার তৈরীর কাহিনী খুবই কৌতুহলোদ্দিপক। এ বিয়ার উৎপাদনের পিছনে অক্লান্ত শ্রম দিয়েছেন একজন মিশরীয় তত্ত্ববিদ ও দুইজন বিজ্ঞানী। আর এ জিনিস তৈরী হয়েছে বৃটেনের বৃহত্তম চোলাইকারী স্কটিস এণ্ড নিউক্যাসেলে। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয় ফারাও আখেনাতনের রাণী নেফারতিতির সূর্য মন্দিরের ভেতর পাওয়া একটি পুরানো জাড়ের তলানীর উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছে এ বিয়ার বানানোর ফর্মূলা। গবেষকরা বলেছেন যে, আখনাতন ছিলেন তুতেনখামেনদের পিতা। কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, এ বিয়ারের ক্রয় লব্ধ অর্থ ব্যয় করা হবে মিশরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়নে।

পাঠকরা হয়তোবা ভাবছেন তুতেনখামেন এইলের এহেন তথ্য তুলে ধরায় মানবাধিকারের সাথে এর সম্পর্ক কোথায়? উত্তরে শুধু একথাই বলা যাবে যে, এহেন বিয়ারের উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণে মানবিক মূল্যবোধহীনতার স্বীকার হয়ে যারা উহার উৎপাদন করছেন তাদের বিকৃত বিবেচনার Fanny Hill এর মত অশ্লীল উপন্যাস এবং যৌনকর্মী সৃষ্টির সহায়ক হয়। আর সেখানেই তৈরী হবে মানবাধিকারের বিকৃত বিভ্রান্তিকর মানসিকতা। যে মাতৃত্বের সেবার কারণে আল্লাহ ও তার রসূল (সাঃ)-এর বেহেশতের খোশখবরী আছে সেই নারী মাতৃত্বকে মানবাধিকারের নামে যৌনকর্মী বানানো হচ্ছে। ইসলামের আল কোরানে জেনা-ব্যভিচার, মদকে এবং অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণভাবে হারাম করা হয়েছে। কারণ মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে বাস করার যে অধিকার দিয়ে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, উহাকে পদদলিত করছে পূর্বালোচিত হারাম কাজগুলোই।

www.amarboi.org

মানবাধিকারের বঞ্চনার বিবেচনায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরা যেতে পারে। উহা হলো সুদ সম্পৃক্ত অর্থনৈতিক কথিত উন্নয়ন। সুদ সম্পৃক্ত অবৈধ অর্থের অধিকরণতো মানুষের মৌলিক অধিকারকে বঞ্চিত করেই অর্জিত হয়। অধিকন্তু অবৈধভাবে হারাম পথে অর্থ উপার্জনের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এবং সেখানে হুজুর (সাঃ) বলেছেন ঃ

"হারাম খাদ্য থেকে তৈরী গোস্ত বেহেস্তে যাবে না। যে গোস্ত হারাম খাদ্যের দ্বারা প্রতিপালিত তার জন্য আগুন বা জাহান্নামই উপযোগী।" অধিনস্থদের অধিকার হরণ করেইতো মনিবদের মানবাধিকার লংঘন। সেক্ষেত্রেও হুজুর (সাঃ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

"অধিনস্থদের সাথে খারাপ আচরণকারীরা বেহেস্তে যাবে না।"

বঞ্চিতদের অধিকার হরণের মাধ্যমে যে বিত্তের জেল্লা উহা প্রকাশের মাধ্যমে এক ধরনের অহংকারও আছে। কে কতবেশী টাকার মালিক সে খবর ছড়িয়ে দিয়ে অনেকেই দারুণ সুখ পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঃ

"হীরামুক্তা মানিক্যের ঘটা যেন ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রধনুচ্ছটা।" এই ইন্দ্রজালের পিছনে যুগে যুগে মানুষ ছুটছে। মণিমুক্তার জন্য লড়াইয়ের ইতিহাসের পাতা ভর্তি করে রেখেছে। সেখানে মানবতার প্রয়োজন মিটাবার মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়গুলো যোদ্ধোক্তরা বিবেচনা করে নাই। মানুষই হীরা মুক্তা-মানিক্যের মূল্য স্থির করেছে। যা দুর্লভ তার জন্যই মানুষের যত কাড়াকাড়ি। অথচ মণি-মানিক্য মানুষের নিত্যদিনের কোন কাজে আসে না। সিন্ধুকে অলস হয়ে পড়ে থাকে সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে। হীরা-মুক্ত ফেলেই যে মানুষকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে মানুষ তা ভুলে যায়। বিত্তের জেল্লা মানুষকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না। অথচ ঐ বিত্তবানদের হাতে আজ মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছে বেশী। বিত্তের জেল্লা মানুষকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না। তারপরেও কাড়াকাড়ি আর লোভের শেষ নাই। আর এ কারণেই জেনেভার এক নীলাম ঘরে একটি হিরক খণ্ড এক কোটি পয়ষট্টি লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়েছে। আমাদের দেশের মানে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। যিনি ঐ দুর্মূল্যের হিরক খণ্ডের মালিক হয়েছেন তিনি একজন সৌদী জুয়েলার্স। হীরক খণ্ডের ওজন ১০০ ক্যারাটের উপর। দক্ষিণ আফ্রিকার খনি থেকে উত্তলিত।

www.amarboi.org

হীরা মানিক কে কেনে, কেন কেনে, কি কারণে অমন হীরা অমন দামে বিক্রি হয়, সেসব প্রশ্ন মনে জাগে। হীরার দাম কেন এতবেশী। হীরা পরিধান করলেই বা কি আর না করলেই বা কি, সে প্রশ্নের জবাব আমরা জানি না। যারা ৬০-৭০ কোটি টাকার ঐ হীরা কেনে তারাই বলতে পারে ওসব রত্নরাজির কোন্‌টায় কি সুখ। তবে একথা সত্য যে, বিত্তের জেল্লায় কোন সুখ নেই, বরং এক ধরনের অহংকার আছে। এ ধরনের অহংকারের বিবেচনা ইসলামে নাই। এর প্রমাণ নবী এবং ওলীদের জীবন চরিত্র যা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের হাকীকতের আমল থেকে সৃষ্টি হয়।

ইসলামের কোন কোন বিরুদ্ধবাদীরা আল কুরআনের যুদ্ধের আয়াতগুলোকে মানবাধিকার বিরুদ্ধে বিবেচনায় বলতে চেয়েছেন যে, আল কুরআনের ঐ আয়াত-গুলো মানুষের অধিকারের অন্তরায়। কারণ যুদ্ধ ও হত্যার নির্দেশে যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উহাতো মানবাধিকারের দর্শনের ধারণা নয়।

এ ধরনের বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারে শুধু একথাই বলা যেতে পারে যে, তারা মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য সংক্রান্তের বিষয়গুলোকে বিবেচনা করতে শেখে নাই। যখন কোন বৈজ্ঞানিক কোন একটি মেশিন তৈরী করেন, তখন এর পরিচালনা সংক্রান্তের নিয়মগুলো তাকেই বলে দিতে হয়। তেমনি যে আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তৈরী করলেন তার পরিচালনার বিধি-বিধানতো তাকেই নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে মানুষের অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এহেন বিবেচনা মৌলিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর এ কারণে আল্লাহ্ তার আল কুরআনে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মোমেনদের একটি দল সৃষ্টি করে নিলেন এবং তাদেরকে বলে দিলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

"এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিতর রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

www.amarboi.org

আর ঐ মোমেনদেরকে একথাও বলে দিলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَا نَصِيْرًا ـ

"একদল নির্যাতিত নারী-পুরুষ ও শিশু অনবরতই কেবল ফরিয়াদ জানাচ্ছে যে, হে প্রভু আমাদেরকে এ যালেমদের বসতি থেকে দূরে নিয়ে যাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন বিশেষ সাহায্যকারী ও ত্রাণকর্তা পাঠাও। তোমরা আল্লাহর পক্ষে সেইসব নির্যাতিতদের মুক্তি দেয়ার জন্য যুদ্ধ কর না কেন ?"—(সূরা আন নিসা ঃ ৭৫)

ঐ একই সূরাতে আবারও বলে দিলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর যারা কাফের তারা যুলুম ও অন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের অনুচরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কারণ শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৭৬)

জালেম তারাই যারা অহেতুকভাবে অন্যের অধিকারকে হরণ করে। আল্লাহ যদি যুদ্ধের ঐ আয়াতগুলো না রাখতেন তখন মানুষের মৌলিক এবং মানবিক অধিকারগুলো কে বা কার দ্বারা এবং কিভাবে রক্ষিত হতো ? মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার্থে আল্লাহ যদি জেহাদের জন্য একটি দলকে উৎসাহিত না করতেন, তবে অধিকার বঞ্চিত মানবগোষ্ঠীর কি করুণ অবস্থা হতো উহা কি আমরা একবারও ভেবে দেখেছি ? মানুষ যিনি সৃষ্টি করলেন তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্বতো তারই হতে হবে। কারণ স্রষ্টাতো তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত

www.amarboi.org

হতে পারেন। এ ব্যাপারেও হুজুর (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে বলেছেন ঃ "আমি ছিলাম গোপন ঐশ্বর্য, আমার ব্যক্ত হবার বাসনা হলো। তাই মানুষ সৃষ্টি করলাম।"—(হাদীসে কুদসী)

সৃষ্টির দর্শনে একথা কি আমরা বুঝতে পারি যে, যিনি যা সৃষ্টি করেন তা তার ঐশ্বর্যকে বা খ্যাতিকে অক্ষুণ্ন রাখবে না ? তিনি কি চাইবেন তার নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে ? বরং তার সৃষ্টিতেই তিনি আনন্দ পাবেন। কারণ সৃষ্টির সৌন্দর্যতে তিনি স্বভাবতই শান্তি পাবেন। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদেরকে শেষ বারের মত বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের হত্যার দর্শন মানুষের মৌলিক অধিকারকে রক্ষাকল্পেই দেয়া হয়েছে। যাকে আমরা ইংরেজীতে Preventive বলতে পারি। আল্লাহ অহেতুকভাবে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি একদল মানুষকে জেহাদের নামে অন্যদলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে যুদ্ধ ও হত্যা দেখে তিনি আনন্দ পাবেন কি ? মনে রাখতে হবে এটা স্রষ্টার দর্শন নয়।

১৯৪৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় এবং সেখানে ৩০টি ধারায় মানুষের জীবনের সামগ্রীক অধিকার নিয়ে বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর ঐ ধারা কয়টি নিয়ে মানবাধিকারের আন্দোলনে সারা বিশ্ব তোলপাড় করা হচ্ছে। ভাবখানা এই যে, ইসলামে মানবাধিকার বলতে কিছুই নেই।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত মানবাধিকার এই সার্বজনীন ঘোষণা-পত্রটির ত্রিশটি ধারা নিম্নে হুবহু দেয়া হল—যা মেনে চলতে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

ধারা—১ ঃ সকল মানুষই (শৃঙ্খলহীন) স্বাধীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা সকলেই বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। অতএব তাদের একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা উচিত।

ধারা— ২ ঃ যে কোন প্রকার পার্থক্য, যেমন ঃ জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকারের অংশীদার। অধিকন্তু, কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, স্বায়ত্বশাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকারে সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, সার্বজনীন মানবাধিকারের সুফল লাভে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে

www.amarboi.org

কোন পার্থক্য করা চলবে না, তার রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদা যা-ই থাকুক না কেন।

ধারা–৩ ঃ প্রত্যেকেরই জীবন-ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা–৪ ঃ কাউকে দাস হিসেবে কিংবা দাসত্বের বন্ধনে রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

ধারা–৫ ঃ কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ করা কিংবা কাউকে নির্যাতন করা বা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা চলবে না।

ধারা–৬ ঃ আইনের কাছে প্রত্যেকেরই সর্বত্র মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা–৭ ঃ আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোন রকম বৈষম্য ছাড়া সকলেরই আইনের আশ্রয়ে সমানভাবে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লঙ্ঘনকারী কোন রকম বৈষম্য বা বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধে রক্ষা পাওয়ার সমধিকার সকলেরই আছে।

ধারা–৮ ঃ যেসব কাজের ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন করা হয় তার জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার লাভ বা আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা–৯ ঃ কাউকে খেয়াল-খুশীমত গ্রেফতার বা আটক করা অথবা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

ধারা–১০ ঃ প্রত্যেকেরই তার নিজের বিরুদ্ধে আনা যে কোন ফৌজদারী অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য সমান অধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার রয়েছে। এভাবে প্রত্যেকই তার অধিকার ও দায়িত্বগুলো ও প্রয়োজনে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ আদালতের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে পারে।

ধারা–১১ ঃ (ক) কেউ কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে সে এমন কোন গণআদালতের আশ্রয় নিতে পারে যেখানে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা পাবে। এই গণআদালত যতক্ষণ তাকে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দোষ বলে বিবেচিত হবার অধিকার রয়েছে।

www.amarboi.org

(খ) কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না, যদি সে কাজটি করবার সময় তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ করবার সময় আইন অনুযায়ী যতটুকু শাস্তি দেয়া যেত তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ করা চলবে না।

ধারা—১২ ঃ কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ী বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশীমত হস্তক্ষেপ করা চলবে না। কারো সম্মান ও সুনামের উপর ইচ্ছামত আক্রমণ করা চলবে না।

ধারা—১৩ ঃ (ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল করা ও বসতিস্থাপন করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

(খ) প্রত্যেকেরই নিজের দেশ বা যে কোন দেশ ছেড়ে যাবার এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রয়েছে।

ধারা—১৪ ঃ (ক) নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং আশ্রয় লাভ করবার অধিকার রয়েছে।

(খ) অরাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে এই আশ্রয় লাভের অধিকার না-ও পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপের ফলে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রেও এ অধিকার না পাওয়া যেতে পারে।

ধারা—১৫ ঃ (ক) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার আছে।

(খ) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবার কেউ তার জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চাইলে তার সেই অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

ধারা—১৬ ঃ (ক) পূর্ণ বয়স্ক নারী ও পুরুষের জাতিগত বাধা, জাতীয়তার বাধা অথবা ধর্মের বাধা ছাড়া বিবাহ করার ও পরিবার গঠন করার অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার রয়েছে।

(খ) কেবলমাত্র বিবাহ ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রী পরস্পরের পূর্ণ সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

www.amarboi.org

(গ) পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক গোষ্ঠী। অতএব সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে পরিবারের।

ধারা—১৭ ঃ (ক) প্রত্যেকেরই একা এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

(খ) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল-খুশীমত বঞ্চিত করা চলবে না।

ধারা—১৮ ঃ প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতাও রয়েছে প্রত্যেকের। একা অথবা অপরের সহযোগিতায়, প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান ও প্রচার করার স্বাধীনতাও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজ বিশ্বাস ও ধর্ম, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার অধিকার।

ধারা—১৯ ঃ প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপ মতামত পোষণ করা এবং যে কোন উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানাবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা—২০ ঃ (ক) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হবার অধিকার আছে।

(খ) কাউকেই কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা—২১ ঃ (ক) প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।

(গ) জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি। এই ইচ্ছা সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে। গোপন ব্যালট অথবা এ ধরনের অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা—২২ ঃ সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। নিজ রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুযায়ী প্রত্যেকেই তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো

www.amarboi.org

আদায় করতে পারেন। এ জন্য জাতীয় প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের।

ধারা—২৩ (ক) প্রত্যেকেরই কাজ করার ও অবাধে চাকুরী নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থান লাভ করবার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষা পাবার অধিকারও আছে প্রত্যেকের।

(খ) প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান সমান বেতন পাওয়ার অধিকার আছে।

(গ) প্রত্যেক কর্মী তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষা করবার মত ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী। প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক মান রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা লাভেরও অধিকার আছে তার।

(ঘ) প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা—২৪ ঃ প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। কার্য সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা—২৫ ঃ (ক) নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য কল্যাণের জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রার মানের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কাজের সুবিধা লাভের অধিকারও এই সঙ্গেই প্রত্যেকের প্রাপ্য। বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন-যাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভ এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে ; শিশুর জন্ম বৈবাহিক বন্ধনের ফলেই হোক বা বৈবাহিক বন্ধন ছাড়াই হোক না কেন।

ধারা—২৬ ঃ (ক) প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাতে সর্বসাধারণ লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

(খ) প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। মানবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকারগুলোর প্রতি যাতে শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় হয় সেদিকে জোর দেয়াও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের

www.amarboi.org

সমঝোতা ও সহিষ্ণুতায় আস্থাশীল করে তুলতে হবে। এই শিক্ষা সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বন্ধুত্ব উন্নয়নে এবং শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

(গ) পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের কোন্ ধরনের শিক্ষা দিতে চান, তা আগে থেকে বেছে নেয়ার অধিকার সকল পিতা-মাতার রয়েছে।

ধারা—২৭ ঃ (ক) প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ করা ও শিল্পকলা চর্চা করার অধিকার রয়েছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলগুলোর অংশীদার হওয়ার অধিকারও রয়েছে।

(খ) বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলাভিত্তিক সৃজনশীল কাজের থেকে যে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের উদ্ভব হতে পারে তা রক্ষা করার অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের।

ধারা—২৮ ঃ প্রত্যেকেই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী সেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

ধারা—২৯ (ক) সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে। এই কর্তব্যগুলো পালনের মাধ্যমেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

(খ) নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবার সময় একথা প্রত্যেকেরই মনে রাখতে হবে যে, তাতে যেন অপরের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি কোনরূপ অস্বীকৃতি বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায়। অধিকন্তু, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আইন মান্য করেই প্রত্যেকে তার অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারবে।

(গ) এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার সময় কোন রকমেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না।

ধারা—৩০ ঃ এই ঘোষণার উল্লিখিত কোন বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না। এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার আছে—এ রকম ধারণা করবার মত কোন ব্যাখ্যা চলবে না।

—সূত্র ঃ মোহাম্মদী নিউজ এজেন্সী (এম. এন. এ)

www.amarboi.org

উল্লেখিত ধারাগুলো আজ থেকে ৩০ বছর আগে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণিত হয়েছে। অথচ যিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে যে অধিকার দিলেন তা যুগে যুগে পদস্খলিত হবার কারণে মানুষের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ পাক ১৫০০ বছর আগে মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে ঐশী আল কুরআন অবতীর্ণ করে তাদেরকে পূর্বালোচিত ৩০ ধারার অতিরিক্ত অধিকার দিয়ে শুধু ইহজগতেই নয় বরং পরজগতেও অধিকার ভোগের উচ্চ মার্গ জান্নাতে নেবার ওয়াদা করেছেন।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তাদাব্বুরে কুরআন (১-৯ খণ্ড) মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)–মাওঃ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)–আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (র)
- সুনানে ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড) আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-৪ খণ্ড)–ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী (র)
- ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলামে মানবাধিকার–মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন
- আসমাউল হুসনা–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা–আমীন আহসান ইসলাহী
- ঈমানের পরিচয়–মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম
- চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব–মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম
- বিকালের আসর–১–আব্বাস আলী খান
- আমার বাংলাদেশ–অধ্যাপক গোলাম আযম
- প্রশ্নোত্তর–অধ্যাপক গোলাম আযম
- তাকবিয়াতুল ঈমান–শাহ ইসমাঈল শহীদ
- ইবাদাতের মর্মকথা–ইমাম ইবনে তাইমিয়া
- তিব্বে নববী–হাফিজ আকরমুদ্দীন
- কুরআনে আঁকা আখিরাতের ছবি–এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
- সত্যের মাপকাঠি–মোঃ নাজমুল ইসলাম